



সিরাজুল
ইসলাম চৌধুরী
বাংলা ভাষার
ধ্রুপদী গদ্যশিল্পী

৩ পৃষ্ঠা

sompri.pabna@gmail.com

সম্প্রীতি

বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ



সম্প্রীতি বাংলাদেশ
প্রতি মাসের
১৪ তারিখ
প্রকাশিত হয়



www.sompribangladesh.com

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।/নির্মল করো উজ্জ্বল করো, /সুন্দর করো হে।/জ্যোত করো, উদ্যত করো, /নির্ভয় করো হে।/মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।/অন্তর মম বিকশিত করো, /অন্তরতর হে।/যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, /মুক্ত করো হে বন্ধ, /সঞ্চার করো সকল কর্মে/শান্ত তোমার হৃদ।/চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, /নন্দিত করো, নন্দিত করো, /নন্দিত করো হে।/অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ • সংখ্যা ১১ • ২৯ আশ্বিন ১৪৩৩ • ঢাকা বুধবার • ১৪ অক্টোবর ২০২৬ • ২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি • পৃষ্ঠা ৮ • ১০ টাকা



নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার। ছবি দুটি চলনবিলের চাটমোহর অংশ থেকে নেয়া।

মরণফাঁসে মাছের ভান্ডার

আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

চলনবিলের দেশি প্রজাতির প্রাকৃতিক মাছের স্বাদ এখন সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় অপরিচিত হয়ে উঠেছে। অথচ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এখানকার মাছ ভারতের কলকাতার বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ অঞ্চলে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তখন ছিল ‘মাছের ট্রেন’ নামে একটি বিশেষ ট্রেন। চলনবিলের ইতিহাস থেকে জানা গেছে ট্রেনটি রাতভর চলনবিলের পাবনা ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে মাছ নিয়ে পৌঁছে যেত কলকাতায়।

চলনবিলের মাছ কলকাতার বাণিজ্যিক বাজারে নিয়ে যেতেই ১৯১৫ সালে চলনবিলের বুক চিড়ে নির্মাণ করা হয়েছিল বিশাল রেলপথ, যা এখন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময় এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও অনেকদিন সেই ট্রেনের চলাচল ছিল। সে সময় মৎস

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মাছের যম ১৮ বাঁধ

মোসতাহা সতেজ

পাবনার উপজেলা পর্যায়ে ৩০ বছরের বেশি কাল যাবত মৎস্য বিভাগে মাত্র পাঁচজন জনবল দিয়ে অফিস পরিচালনা করায় মৎস্য সংরক্ষণ এবং আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে মৎস্য খাত সম্প্রসারণ ও আইন বাস্তবায়নসহ সব কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে। ‘জল যার জলা তার’ এই নীতির আলোকে জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

অতীতে মাছের জন্য খ্যাত ছিল পাবনা। বর্তমানে মৎস্য আবাদ স্থান বা জলজ পরিবেশ সংকুচিত হয়ে আসছে। জেলা মৎস্য বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক ড. বায়োজিদ আলম জানান, ২৯ লাখ মানুষের এই জেলায় ২০২৪-২৫ সালে মাছের উৎপাদন ছিল ৭৯ হাজার ৪৭৮ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে বাজারে চাহিদা ছিল ৬৩ হাজার ৭২০ মেট্রিক টন। উদ্বৃত্ত হয় ১৫ হাজার ৭৫৮ মেট্রিক টন। সরকারিভাবে রেনু উৎপাদন ৪৫৫ কেজি। বেসরকারিভাবে রেনু উৎপাদন হচ্ছে ২৬ হাজার ৭৬২ কেজি। জেলায় মৎস্য নার্সারি রয়েছে ৭৬৫টি। পোনা মাছের চাহিদা ৮২০ লাখ হলেও পোনা উৎপাদন চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত থাকছে ২৩১ লাখ।

বর্ষা ও শরৎ মৌসুমে ব্যস্ত থাকা মৎস্য অফিস সূত্রে আরও জানা গেছে, জেলায় প্রাকৃতিক উৎস যমুনা ও পদ্মা থেকে বছরে ইলিশ আহরণ করা হয় ৮৪ মেট্রিক টন। ১৪ হাজার ৫৭৬

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কয়েক বছর আগে চলনবিল থেকে ধরা এই বোয়াল মাছটির দাম হাঁকা হয়েছিল আড়াই হাজার টাকা



আলোচনায় গঙ্গা চুক্তি নবায়ন

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ভারতের সঙ্গে ৩০ বছরের ঐতিহাসিক গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে। এখন এই চুক্তি নবায়নের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের পানি সমস্যা সমাধান হওয়া না হওয়ার বিষয়। ঢাকা ও দিল্লির কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, তিন দশকের এই চুক্তি নবায়ন এখন শুধু পানি বন্টনের বিষয় নয়, এটি দুই প্রতিবেশী দেশের পারস্পরিক আস্থা, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কের একটি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

জানুয়ারি থেকে ভোট শুরু

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

আগের ঘোষণা অনুযায়ী চলতি বছর স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও, সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার। জানানো হয়েছে, আগামী বছরের শুরু থেকে ধাপে ধাপে এ নির্বাচন হবে।

এ বিষয়ে গত ২৯ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম সাংবাদিকদের জানান, আগামী বছরের জানুয়ারি

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫



অভাবে বাড়ছে নৈরাজ্য

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

আকাশচুম্বি দ্রব্যমূল্য, কর্মহীনতা, আয়-ব্যয়ের সীমাহীন বৈষম্য, চাকুরিচ্যুতি, বেকারত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যে দুরবস্থা ইত্যাদি নানা প্রতিকূল প্রেক্ষাপটে জনজীবনে বড় মাপে সমস্যা চলছে। অভাবজনিত সমস্যা সামাজিক ক্ষেত্রে এক ধরনের নৈরাজ্যের পরিচিতি ডেকে আনছে। এ কারণে ছোটখাটো ব্যাপারেও খুনোখুনি, সংঘাত, হানাহানি ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে ছোট বা বড় ঘটনাকে আইনি নিয়ন্ত্রণের উপর ছেড়ে না দিয়ে ‘মব জাস্টিসের’ আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিনের নানা ঘটনা এই নৈরাজ্যের অবস্থার চিত্র তুলে ধরছে।

পাবনা সদরের চরাঞ্চল এবং অন্যান্য উপজেলার গ্রাম-গঞ্জ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, অভাবের তাড়নায় অনেক মানুষের অবস্থাই এখন নাজুক। পেটের ক্ষুধা এবং জীবন-যাপনের চাহিদা মেটাতে তরুণ-

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১



মাটি ও মানুষের সংগ্রামে
সম্প্রীতি কে শুভেচ্ছা



DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217



বুধবার
১৪ অক্টোবর ২০২৬



‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে । / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে । / জাতিত করো, উদ্‌যত করো, / নির্ভয় করো হে । / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে । / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে । / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সপ্ধার করো সকল কর্ম/ শান্ত তোমার ছন্দ । / চরণপাশে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে । / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে ।’



মালয়েশিয়ায় উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা

তরুণ ফিহা হুসাইনের রৌপ্যপদক জয়

শাহীন রহমান

মালয়েশিয়ায় আয়োজিত সম্মানজনক আন্তর্জাতিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা ওয়ার্ল্ড ইনভেনশন কম্পিটিশন অ্যান্ড এক্সিবিশন ২০২৬-এ সিলভার মেডেল (রৌপ্যপদক) অর্জন করেছেন বাংলাদেশের তরুণ উদ্ভাবক ফিহা হুসাইন।

সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর প্রজেক্ট সোলার এফিক্স উদ্ভাবন করে অ্যাপলাইড ফিজিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটাগরিতে তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছেন। ফিহা হুসাইন পাবনা পৌর শহরের জেলাপাড়ার বাসিন্দা সাজ্জাদ হোসেন ও ফারজানা হোসেন দম্পতির সন্তান।

যেভাবে কাজ করে সোলার এফিক্স : বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সংকট নিরসন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব বিবেচনা করে সোলার এফিক্স (সোলার ফার্মের জন্য এআই-ভিত্তিক ক্রটি শনাক্তকরণ ও কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা) শীর্ষক এই প্রজেক্টটি তৈরি করা হয়েছে। সাধারণত বড় সোলার ফার্মে ধূলাবালি, ছায়া, অতিরিক্ত তাপমাত্রা কিংবা তারের সংযোগের সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকটাই কমে যায়। সোলার এফিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে প্রতিটি সোলার প্যানেল সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করে। এটি যেকোনো সম্ভাব্য ত্রুটি আগাম শনাক্ত করে, নির্দিষ্ট কোন প্যানেলে সমস্যা হচ্ছে তা নির্ধারণ করে এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে।

প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক সাফল্য : এর আগে দেশের জাতীয় পর্তে প্রায়



মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক জয়ী তরুণ ফিহা হুসাইন

২৫০টিরও বেশি উদ্ভাবনী প্রজেক্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হন ফিহা এবং আন্তর্জাতিক রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের একাধিক বৃট ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেন তিনি। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বাংলাদেশের একজন ডেলিগেট হিসেবে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন এই তরুণ। মালয়েশিয়ার সেগি ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, কানাডা, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াসহ ১২টিরও বেশি দেশের ৪০০টিরও বেশি প্রজেক্ট অংশ নেয়। এর মধ্যে অফলাইন প্রদর্শনীতেই ছিল প্রায় ৩০০টি প্রজেক্ট। ফিহা তাঁর ক্যাটাগরিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রায় ৫০টি

শক্তিশালী প্রজেক্টকে পেছনে ফেলে এই বিশেষ গৌরব অর্জন করেন।

উল্লেখ্য ও সম্মান উৎসর্গ : আন্তর্জাতিক মঞ্চে লাল-সবুজের পতাকা উঁচিয়ে সম্মাননা নেওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় ফিহা হুসাইন বলেন, পাবনার একজন তরুণ হিসেবে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা এবং দেশের অসাফল্য নিয়ে আসতে পারাটা অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের। ভবিষ্যতে সোলার এফিক্সকে আরও উন্নত করে দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বড় অবদান রাখার লক্ষ্য রয়েছে। এই সাফল্য নিয়ে ফিহা সমগ্র পাবনাবাসীকে উৎসর্গ করেছেন। এই আন্তর্জাতিক যাত্রায় সার্বিক সহায়তার জন্য তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি।

আলোচনায় গঙ্গা চুক্তি নবায়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর : বড় পরীক্ষা। চুক্তি নবায়ন হলে বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি পাবে, আর পানি না পেলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, নৌ চালাচল ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি চুক্তি নবায়ন বা নতুন করে চুক্তি হয়, তাহলে দেশের কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল থাকবে, ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমবে, লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে এবং সুন্দরবনসহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা সহজ হবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত, বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক যোগাযোগের মতো বড় ইস্যুগুলোতেও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হবে। পাশাপাশি অভিন্ন নদীগুলোর পানি ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি, বিশেষ করে তিস্তা, ফেনীসহ অন্যান্য নদী নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একমাসের মধ্যে চুক্তি নবায়ন বা নতুন চুক্তি না হলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়বে। রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও পাবনা অঞ্চলের কৃষি, গড়াই নদীর প্রবাহ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ কঠিন চাপের মুখে পড়বে। বিশেষ করে কৃষিতে সেচের পানি কমবে, মাটির অর্দ্রতা কমবে এবং লবণাক্ততার কারণে ফসল উৎপাদন কমবে। ফলে শুষ্ক মৌসুমের বোরো ও অন্যান্য কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। পাশাপাশি পানি কমে গেলে নদীগুলো আরও দ্রুত নাব্যতা হারাবে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যাহত হবে। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ বাড়বে। পানির স্তর আরও নিচে নেমে যাবে। তাছাড়া চুক্তি না থাকলে বাংলাদেশ নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি পাওয়ার আইনি ও কূটনৈতিক নিশ্চয়তা

হারাবে। ভারত তখন নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি প্রত্যাহারের সুযোগ পাবে। চুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, এ বছর ১২ ডিসেম্বর মিয়ানমারীর্ণ হতে চলা ১৯৯৬ সালের চুক্তিটি শুধু নবায়ন না করে, গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে একটি নতুন চুক্তি চায় বাংলাদেশ। এই মন্তব্যের পর গত ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল দ্বি-সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার গঙ্গা ও অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) মাধ্যমে আলোচনা করা হবে। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকগুলোও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পানি-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি কার্যকর রয়েছে। তিনি এও উল্লেখ করেছেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে এবং পানি বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়গুলো যৌথ নদী কমিশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক কাঠামোর মাধ্যমে সমাধান করা হয়ে থাকে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, চলতি মাসেই এ বিষয়ে চুক্তি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত উভয় পক্ষই। পানিবিশেষজ্ঞ ড. আইনুল নিশাত গণমাধ্যমকে বলেছেন, নতুন করে একটি নিরাপদ ও কার্যকর চুক্তি করা গেলে তা দুই দেশের জন্যই ইতিবাচক হবে। তবে তা সম্ভব না হলে বাংলাদেশ পানিসংকটে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবে। এ ধরনের চুক্তি কোনো একতরফা উদ্যোগে সম্ভব নয়। এর জন্য উভয় দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

অভাবে বাড়ছে নৈরাজ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর : যুবকরা পর্যন্ত বিপথে চলে যাচ্ছেন। ফলে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাজজানি, চাঁদাবাজী নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইনরক্ষাকারী মহল এই বাস্তবতায় তেমন কিছুই করতে পারছে না। আমাদের হাতে আসা কয়েকটি খবর অনুযায়ী, পাবনার ঈশ্বরদীতে ডাকাতিরোধে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। গোকুলনগর এলাকায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাত থাকে পাল্লাক্রমে এমন পাহারা চলছে। স্থানীয়দের ভাষা, কয়েকদিন ধরে গভীর রাতে আল্গেয়াক্সসহ ৮-১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সন্দেহজনক চলাফেরা লক্ষ্য করেছেন তারা। এমন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন স্থানীয়রা। প্রায় ৫০ জনের সমন্বয়ে দল গঠন করে এলাকার প্রবেশপথ ও অলিগলিতে নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে দিতে বিশেষ যোগাযোগব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। একইসঙ্গে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে এলাকায় মাইকিং ও সচেতনতামূলক প্রচারণাও চালানো হচ্ছে।

খাদ্যাভাবে বানর : ঈশ্বরদীতে হঠাৎ করেই বেড়েছে বানরের উৎপাত। দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি ও ফসলি জমিতে ঢুকে খাবার ও বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি গাছপালা ও স্থাপনার ক্ষতি করছে বানরের দল। এমনকি রিসোর্টে আগত দর্শনার্থীদেরও বিরক্ত ও আতঙ্কিত করেছে এরা। ঈশ্বরদী উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের জয়নগর এলাকার বিভিন্ন স্থানে এই অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, প্রথম দফায় ২ মাস আগে কোনো জঙ্গল বা আশপাশের এলাকা থেকে চার-পাঁচটি বানর জয়নগর এলাকায় আসে। এলাকাটিতে দোকানপাট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রিসোর্ট থাকায় সেখানে আসা পর্যটকরা বানরগুলোকে বিভিন্ন খাবার খেতে দিতেন। পরে বানবের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এরা এখন দল বেধে বিভিন্ন দোকান থেকে খাবার চুরি করছে। বসতবাড়িতেও খাবারের জন্য হানা দিচ্ছে। কয়েকজন জানান, খাবারের সন্ধানে দলবদ্ধভাবে বানরের

দল দোকানপাট, বসতবাড়ি, রান্নাঘর ও রিসোর্টের বিভিন্ন স্থানে ঢুকে পড়ছে। এরা বাড়িঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ও গাছপালারও ক্ষতি করছে। স্থানীয় খাইরুল্ল গ্রুপেরপ্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুনিম তাজওয়ার অহিন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘আমাদের স্বল্পদ্বীপ রিসোর্টে আগত দর্শনার্থীদের ওপর প্রতিনিয়ত বানরের দল তেড়ে আসছে। রিসোর্টের ভেতরে থাকা ক্যান্টিনগুলো থেকে চিপস, কেকসহ বিভিন্ন খাবার লুটপাট করে নিচ্ছে। এতে রিসোর্টে আগত পর্যটকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন।’

মজুত ২৫১ বস্তা সার উদ্ধার : পাবনার সদর উপজেলায় দুর্ঘলিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাবনা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একটি গোড়াউনে তাল্লা ভেঙ্গে মজুত ২৫১ বস্তা সার উদ্ধার করেছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে অভিযান চালানো হয়। অভিযান সংশ্লিষ্টরা জানান, সরকারিভাবে সারের সংকট নেই বলা হলেও এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বেশি দামে বিক্রির আশায় সার গোপনে মজুত করছেন। দুর্ঘলিয়া বাজারের ব্যবসায়ী আবদুল মান্নান ও সার মজুত করছেন- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তাল্লা ভেঙে গোড়াউনেপ্রবেশ করে ২৫১ বস্তা সার পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে ডিএপি ৭৭ বস্তা, ইউরিয়া ১৬ বস্তা, টিএসপি ৪২ বস্তা, এমওপি ৮০ বস্তা এবং ম্যাগনেসিয়াম-দস্তা ৩৭ বস্তা।

ব্লিচিং পাউডার-পামওয়েল দিয়ে দুধ তৈরি : বেড়া উপজেলার পেচাকোলা গ্রাম এলাকার দুই ঘোষের বাড়িতে ২৮ সেপ্টেম্বর অভিযান চালিয়ে ত্র্যামাণ আদালত বিপুল পরিমাণ নকল দুধ ও তা তৈরির ক্ষতিকর উপকরণ জন্ড করেছে। ত্র্যামাণ আদালত জানায়, দুই বাড়ি থেকে বড় আকৃতির ডগে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ কৃত্রিম নকল দুধ জন্ড করা হয়। একই সঙ্গে জন্ড করা হয়- নকল দুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত পাম ওয়াশ, ব্লিচিং পাউডার, কেমিক্যাল জেল, খাবার সোডা, গরম ছানার পানি, এক গ্রেগে ক্রিম, ফ্যাট তোলা দুধ ও ব্লেন্ডার মেশিন।

এডওয়ার্ড কলেজের স্মৃতিময় দিনগুলো

৪-এর পৃষ্ঠার পর : রেস্টুরেন্টে’ বসে চপ্, সিঙ্গাড়া, চা খেতাম। টিপুর আবার নামানুসারে জ্যাকসন রোডের নাম আবদুল হামিদ রোড হয়েছিল। এখনও এই নাম বহাল আছে। তখনতো পাবনায় রেস্টুরেন্ট ছিলনা বললেই চলে। পশ্চিম বাংলা থেকে আসা একজন এই রেস্টুরেন্টের মালিক ছিলেন। আমরা প্রত্যেকে পালা করে বিল পরিশোধ করতাম। আমাদের সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসে বিজ্ঞানে একমাত্র মেয়ে ছিল কামরুন্নেসা, আর আই.এ. তে ছিল খাদিজা খানম বাণী। কামরুন ১৯৪৯ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। পরবর্তীতে পদার্থ বিদ্যায় পিএইচডি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হয়েছিল। কলেজে থাকতেই শামসুল কামরুনকে ‘বুক’ করে রেখেছিল। কাজেই ওঁদিকে কারও নজর দেবার উপায় ছিলনা। আর শামসুল খুবই গোঁয়াড় ছিল। বাণীকে নিয়েই আমাদের কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু মগ্ন ছিল। আমি ওদের কান্ডকারখানা দেখে গালাগালি করতাম এবং বলতাম, ‘বেল পাকলে কাকের কি! বাণী এমন পাগল নয় যে তোমাদের কারও গলায় মালা দেবে।’ শেষমেষ বাণীর বিয়ে হয়েছিল পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুবুল হকের সঙ্গে। ড. মাহবুবুল হক মারা গেলে তাঁর শোকসভায় সদ্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া অমর্ত্য সেনকে দেখেছিলাম (খবরের কাগজে) বাণীকে সান্তনা দিচ্ছেন। ছবিতে বাণীকে ভাল চিনতে পারলামনা। দেখলাম ঢুল বব ছাটা এবং আগের চেয়ে বেশ মোটা হয়েছে। আমার ছয় বছরের সহপাঠী বাণীর ব্যথায় আমিও দারুণভাবে ব্যথিত। এক সঙ্গে আইএ পাস করার পরে দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স ও এমএ পড়েছি। বাণী ভাল ছাত্রী ছিল। ১৯৪৯ সালে এডওয়ার্ড কলেজ থেকে বাণী ও আমি প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেছিলাম এবং দুজনই সরকারি বৃত্তি পেয়েছিলাম।

ছাত্র জীবনের আরও কত টুকরো টুকরো স্মৃতি আজও স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে। সেসব থাক। এবার কর্মজীবনের কথায় আসি। এমএ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে আসার পরে প্রায় প্রত্যেকদিনই এডওয়ার্ড কলেজে যেতাম এবং সে সময়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে ওয়েটিংরুমে বসে গল্প-সল্প করতাম। সবার সঙ্গেই ভাল পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নলিনীাবাবু তখন অধ্যক্ষ। স্যারের সঙ্গে একদিন দেখা করলাম। স্যার আমাকে বললেন, ‘আমাদের একজন অধ্যাপক দরকার, যে অর্থনীতি ও পৌরনীতি পড়াতে পারবে। তোমার রেজাল্ট বের হলে আমার সঙ্গে দেখা করো।’ তখন অর্থনীতিতে আমিণুল হক সাহেব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মহিউদ্দিন সাহেব অধ্যাপক ছিলেন। দু’জনের পক্ষে আইএ ও বিএ ক্লাসে পড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। কাজেই একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি আইএ ক্লাসে সিভিল পড়াবেন এবং আইএ ও বিএ ক্লাসে অর্থনীতি পড়াবেন। আমিণুল হক সাহেব ছিলেন ডাক-সাইটে অধ্যাপক। তাঁর পড়ানোর ধরন সব ছাত্র-ছাত্রীকে বিমোহিত করে রাখতো। যেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব তেমনি তাঁর শিক্ষক হিসেবে সুনাম। সারাটা জীবন তিনি সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে কাটিয়েছিলেন। মহিউদ্দিন সাহেব ছিলেন সাদাসিধে গোছের লোক। উনার বাড়ি ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তাঁর উচ্চারণে আঞ্চলিকতা এসে যেত। যেমন তিনি চোরকে ‘চুর’ ছোটিকে ‘ছুট’ বলতেন। সবাই এই নিয়ে ঠাটা-মস্করা করতো। ঠাটা করার কারণে উনি কিছুই মনে করতেন না- শুধু হাসতেন।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল। এরইমধ্যে আমার এমএ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল। হায় খোদা, একি হল! রেজাল্ট শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। বিনামেঘে বজ্রপাত- আমার মোটামুটি সার্বক ছাত্র জীবনে পাজলা পড়লো। সবাই হতভম্ব। একই কথা, এটা কি করে সম্ভব! মাত্র সাত নম্বরের জন্য আমি দ্বিতীয় শ্রেণী পেলাম না। যে ছেলে ম্যাট্রিক ও আইএ পরীক্ষায় সরকারি বৃত্তি পেয়েছে, অনার্স পরীক্ষায় ৫৫% নম্বর পেয়েছে- সে কেন এমএ তে দ্বিতীয় শ্রেণী পেল না! থিওরী পেপার আমার খুবই খারাপ হয়েছিল সত্য, কিন্তু ব্যাকিং পেপারে এতো কম নম্বর পাব- তা আমি স্পষ্টেও ভাবতে পারিনি। অবশ্য আমার রেজাল্ট খারাপ হবার মাত্র একটা কারণই ছিল- এখানে তা বলা যাবেনা। সেই ব্যথা আমি আমৃত্যু বহন করে যাব- অসহ্য ব্যথা!

রেজাল্ট শোনার পরে আমি সাতদিন বাড়ি থেকে বের হইনি। আবার মুখের দিকে তাকানো যায় না। আমার সে কি যন্ত্রনা। বড় ভাইয়ের ব্যথিত মুখ দেখে চোখে পানি এসে যেত। ঘুম-খাওয়া প্রায় বাদই পড়ে গিয়েছিল। আৰা অবশ্য বলতেন মন খারাপ না করতে। উনি এটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে আমাকে প্রবোধ দিতেন। কিন্তু আমিতো জামাতাম এটা দুর্ঘটনা নয়- আমার কৃতকর্মের ফল। সেজন্য আরও বেশি ব্যথা পেতাম। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজন সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার রেজাল্ট শুনে। এক সপ্তাহ পরে মলিন মুখ নিয়ে কলেজে ঢুকলাম। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা অধ্যক্ষ নলিনীাবাবুর চেয়ারে মাথা নীচু করে ঢুকলাম। স্যার তাঁর স্বাভাবসুলভ হাসি হেসে আমাকে বসতে বললেন। তারপর বললেন, ‘তুমি একটা দরখাস্ত দাও। সামনের গভর্নিং বডির মিটিং-এ তোমার Appointment-এর ব্যাপারটা সেয়ে নেব।’ গভর্নিং বডির মিটিং-এ আমার নিয়োগ হল পেটকটা অধ্যাপক হিসেবে অর্থাৎ সিভিল ও ইকোনমিক্সের। ১৯৫৪ সালের ২৪ শে জুলাই আমি এডওয়ার্ড কলেজে যোগদান করি। আমিণুল হক সাহেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে ১ নং কক্ষ গেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এক নম্বর কক্ষে ক্লাস ছিল। দুর্কদুরু বুকে ক্লাসে ঢুকলাম। ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানালো এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ে শুরু করল। ক্লাসে প্রায় একশ জন ছাত্র ও দুইজন মাত্র ছাত্রী ছিল। আমিণুল হক সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিয়েই বের হয়ে গেলেন। রোল কল করলাম। ১নং রোল ছিল আবু হেনার (যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছিল)। হেনা খুবই ভাল ছাত্র ছিল। প্রথমই আবু হেনা আমার নজরে পড়ে গেল, কারণ সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমি একটা ক্লাস পরীক্ষা নিলাম। সে পরীক্ষায় হেনা নম্বর পেল। আবু হেনা আই এ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান দখল করেছিল। পরবর্তীতে সে কিছুদিনের জন্য আমার সহকর্মীও ছিল। পরে হেনা পাবনায় এলে আমার সঙ্গে দেখা- সাক্ষাৎ হত। বা হোক, প্রথম দিন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হলাম এবং কিছু উপদেশমূলক বক্তব্য দিলাম। পিনপতন রিববতায় তারা আমার কথা শুনলো। সেদিন থেকেই আমার অধ্যাপনা জীবনের শুরু হল। আইএ ক্লাসে সিভিল-ইকনমিক্সের ক্লাস ও বিএ তে অর্থনীতির ক্লাস নিতাম। রোজ ভাল করে পড়াশুনা করে ক্লাসে যেতাম। আল্লাহের রহমতে আমি fluently ইংরেজি বলতে পারতাম বলে ক্লাসে কোন অসুবিধা হতনা। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তৃতা শুনতো। আমার মনে হল যেন ক’দিনের মধ্যেই আমি তাদের প্রিয় শিক্ষক হয়ে গেলাম। অধ্যক্ষ মহোদয় ও আমিণুল হক সাহেব আমার খুব প্রশংসা করলেন। হয়তো তাঁরা ছাত্রদের কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে কিছু শুনে থাকবেন। আগেই বলেছি ক্লাসে মাত্র দুটি মেয়ে ছিল। তাদের একজন ছিল পাবনার তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক প্রয়াত রজব আলী মজুমদার সাহেবের মেয়ে। তার নাম ছিল সুফিয়া মজুমদার। ডাক নাম ছিল চমন। আর একটা মেয়ের নাম একদম ভুলে গেছি- শালগাড়িয়ার মেয়ে। পরে সুফিয়া প্রধানমন্ত্রীর কৃষি-উপদেষ্টা আনিসুজ্জামান সাহেবের ঘরবানী হন। সুফিয়া তার স্বামীর সঙ্গে এসেছিল পাবনায়। সে আমার ভাঙ্গা বাড়িতে তার বান্ধবী মেলীর সঙ্গে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সঙ্গে তার ছেলেও ছিল। খুব ভাল লাগলো।

কোরর ঢাকা ঘুরতে লাগলো। দেখতে দেখতে পাকাপাকি অধ্যাপক হয়ে গেলাম। সব সহকর্মীর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। কলেজের সর্বক্ষেত্রে আমার বিচরণ শুরু হল। অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে কলেজ ছাত্র-সংসদের সাংস্কৃতিক বিভাগের শিক্ষক-উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন কলেজ যোগদানের প্রথম বছর থেকেই। আমার মনে হয় এই কলেজে ২৮ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ২০ বছরের বেশি এই দায়িত্ব পালন করেছি। দীর্ঘ ২৮ বছরে কলেজের পর্যায়ক্রমে আমি সর্বজনপ্রিয় নলিনী রায়, আমিণুল হক, ড. শামসুদ্দিন মিয়া, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, খোদা বক্স মিয়া, অমরেরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ড. আবদুর রহমান, ড. মোসলেমউদ্দিন ও ড. আবদুল জব্বারকে পেয়েছি। তাঁদের সবার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। কেন জানিনা, সবাই আমাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমিণুল হক সাহেবকে ‘বড় ভাই’ বলে ডাকতাম এবং উনিও আমাকে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করতেন। আমাকে ছাড়া আমিণুল হক সাহেব চলতেই পারতেন না- আমার উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। ঘনঘন আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠাতেন, আর না হয় নিজেই আমার বাসায় চলে আসতেন (প্রধান ছাত্রাবাসের সুপারের বাসা) এবং কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমার গিল্লীকেও তিনি ছোট বোনের মত স্নেহ করতেন। এক কথায় আমি ছিলাম তাঁর ডান হাত। কলেজে কোনো সমস্যা হলে সাক্ষ অধ্যক্ষই সবার আগে আমাকে ডাকতেন, কারণ কোন অধ্যক্ষই আমার পরামর্শ নিয়ে কোনদিন ঠকেননি। এটা ছিল আমার বিরল সৌভাগ্য। তাঁদের সবাইকে (জীবিত ও মৃত) আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বলতে হয়তো অহঙ্কার প্রকাশ পাবে! সত্যি কথা বলতে গেলে ২৮ বছর আমি দাপটের সঙ্গে এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করেছি। কোনও দিন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করিনি। আমি নীতি নিয়ে চলতাম-কে খুশী হল, বেজার হল, তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা ছিলনা। আমি কাজ করতাম—‘May what come’ এই নীতিতে। আমার মনে পড়েনা যত বড় ছাত্রনেতাই হোকনা কেন- কোন দিন আমার চোখে চোখ তুলে কথা বলেছে। আমি সব সময় ন্যায়ের পক্ষে থাকতাম বলে আপাতত কেউ ক্ষুব্ধ হলেও পরবর্তীতে সে বুঝতে পারতো যে, আমি ঠিকই করেছিলাম। আজও আমার অনেক প্রাক্তন ছাত্র আমাকে একথা বলে এবং শ্রদ্ধা করে। তবুও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমার সু-সম্পর্ক ছিল। প্রায় এগার বছর হল অবসর গ্রহণ করেছি। গত এগার বছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব কান্ডকারখানা দেখছি ও শুনিছ তাতে মনে হয় এই সময়ে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতো দুইরক কথ-একজন অধ্যাপকের দায়িত্বও পালন করতে পারতাম না। হয়তো আমার পৈত্রিক প্রাণটাই চলে যেত। আল্লাহর অশেষ রহমত যে, অমেক আগেই কেটে পড়েছি। গত কয়েক বছরে শিক্ষাক্ষনের ‘বারটা বেজে গেছে।

আগেই বলেছি কলেজের বিভিন্ন ব্যাপারে আমি জড়িত ছিলাম। অধ্যক্ষ সাহেবগণই আমাকে জড়াতেন। বিভিন্ন কমিটির আমি প্রধান ছিলাম- যেমন ছাত্র ভর্তি কমিটি, বিনা বেতনে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটি, রাজস্ব কমিটি, পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি, ভর্তি কমিটি, ছাত্র সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, ছাত্র সংসদ উপদেষ্টা ইত্যাদি। ড. জব্বারের সময় একবার হিসেবে করে দেখলাম আমি সাতটা কমিটির আহ্বায়ক। এক কথায় কলেজে আমি ‘হলুদের গুড়ো’ ছিলাম। ১৯৫৮ সাল থেকে যতদূর মনে পড়ে কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স ক্লাস চালু হয়। এখন দেশে-বিদেশে আমার অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা সু-প্রতিষ্ঠিত। অনার্সে ক্লাস নিতে হত বলে আমার কাজের চাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে এডওয়ার্ড কলেজে অর্থনীতিতে এমএ ক্লাস চালু হয়। মাত্র এক বছর এমএ ক্লাস চালু ছিল। [চলবে]

প্রিয় স্বজন

‘সম্প্রীতি’তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলার অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, ‘সম্প্রীতি’র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা- সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্যদের পক্ষে-

অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্যদ

অধ্যাপক আবু রহিস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাজা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাডা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আখিনুর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালি মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ্জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃদ্ধা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্যদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সালাদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক ইয়াসমিন হোসেন কর্তৃক রাইয়ান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নুটিমার্কেট, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফটের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল

sompriiti.pabna@gmail.com

ওয়েবসাইট

www.sompriitbangladesh.com

ব্লগ

https://sompriitbangladesh.blogspot.com

ইউটিউব

https://www.youtube.com/@sompriitbd

e-mail : sompriiti.pabna@gmail.com
facebook : sompriiti.pabna



শুচি সৈয়দ

১. সেবমাত্র কৈশোরে পা রেখেছি। শৈশবের গন্ধ তখনও কি গা থেকে গিয়েছে? বোধকরি নয়, বই পড়ি মফস্বল শহর পাবনার অল্পদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, শহীদ মওলানা কসিমউদ্দিন আহমদ স্মৃতি কেন্দ্র লাইব্রেরি, জেলা তথ্য কেন্দ্র লাইব্রেরি থেকে এনে। টুকটাক শহরের ছোট কটি বইয়ের দোকান আব্বার রাজনৈতিক সহযোগী, পাবনার ভাষা আন্দোলনের নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা কাকার ‘বইঘর’, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল ভাইয়ের ‘চতুরঙ্গ’, আরজু ভাইয়ের ‘বিকিকিনি মার্চ’ থেকে সীমিত সাধ্যে কিনে (সাধ্যের সেই সীমা আজও ঘোচেনি, শুধুমাত্র বইয়ের দোকানে ঢুকলেই আমার কষ্ট হয়-দারিদ্র্যকে মর্মপীড়াদায়ক বলে মনে হয়।) তখন কারও কাছে বই থাকলেই বন্ধুত্ব হয়ে যেত তার সঙ্গে। বই মানে স্বর্ণখনি, বইই সেতুবন্ধ সম্পর্কের, বন্ধুত্বের। আমাদের পাড়ার বড়রা একটি পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন ‘রাধানগর ইছামতি শহীদ স্মৃতি পাঠাগার’ নামে। বই পড়ার অগ্রহ দেখে আব্বা সেটার সদস্য করে দিয়েছিলেন আমাকে। প্রধানত গল্পের বইই পড়ি আর প্রবন্ধের বই? সেটা সরিয়ে রাখি কেননা সেগুলো কাঠখোঁটা নিরস, টানে না মোটেই। না টানাই স্বাভাবিক কেবল তো কৈশোরে পা রেখেছি। প্রবন্ধের বইয়ের ওপর থেকে সেই বিরাগ কটিতে অনেক সময় লেগেছে। সেই বিরাগ কি আমার অত সহজেই যেত যদি রাশিদুর রহমান রঞ্জু ভাই আমাকে ‘অনতিক্রান্ত বৃত্ত’ বইটি পড়তে দিতেন? চুম্বকের মতো আটকে রাখল আমাকে দুই/তিন দিন-পাঠ শেষে আমি খুঁজতে শুরু করলাম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর আরও প্রবন্ধের বই। ‘তাকিয়ে দেখি’, ‘নিরাশ্রয় গৃহী’, ‘আমার পিতার মুখ’ এগুলো হল প্রবন্ধের বইয়ের নাম! অসম্ভব উদ্দীপ্ত হলাম। এরকম সময়ই তিনি সেই স্বাধীনতা উত্তর সময়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বিচিত্রা’র ধারাবাহিক লিখতে থাকলেন ‘উপকাকাঠামোর ভেতরে’ নামে নিয়মিত কলাম। এমন কাব্যময় আলোজ্জ্বলা গদ্যের পাঠকের অভাব ঘটেনি-একদিন লক্ষ্য করলাম শুধু রঞ্জু ভাই নন, আমি, মঞ্জু ভাই, শিবলী ভাইসহ কমবেশি অনেকেই এমনকি যারা তাঁর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির ঘোর বিরোধী (যেমন শিবলী ভাই, মুকুল ভাই) হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কলামটিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন ঠিকই। সে এক মজার অভিজ্ঞতা। সেই অপরিচীত ভালোলাগার গদ্যের কবিকে প্রথম সামনা-সামনি দেখার সৌভাগ্য হল একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সূত্রে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশনা সংস্থা ‘মুক্তধারা’ দেশব্যাপী একুশে ফেল্ডার উপলক্ষে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করল। ‘জাতীয় জীবনে একুশের প্রভাব’ এই শিরোনামে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার জুটে গেল। পুরস্কার নেবার জন্য তাঁরা ঢাকায় ডাকলেন। সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের

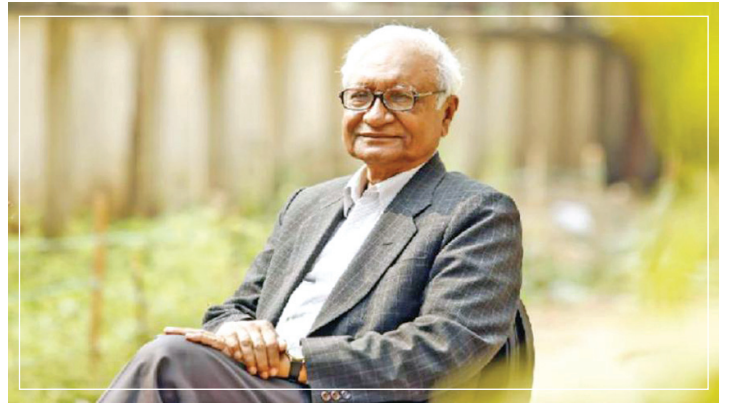
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলা ভাষার ধ্রুপদী গদ্যশিল্পী

প্রধান বক্তাই ছিলেন বোধহয় তিনি। আমি আর শ্যামল দত্ত এসেছিলাম পুরস্কার নিতে। স্কুল পর্যায়ে আমি ২য় আর কলেজ পর্যায়ে ২য় হয়েছিলেন শ্যামল দত্ত- আমরা দু’জনই পাবনা থেকে। আমাদের সাহিত্যে নিরস গদ্যকে যিনি কাব্যের মাত্রা দিয়েছেন তাঁর গদ্য আমাকে এত বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তা বর্ণনা করাও কঠিন। তাঁর অনুকরণে প্রাণপণে লিখতে চেষ্টা করতাম অন্ধের মতো। কৈশোরের সেই হাস্যকর প্রয়াসের অসম্পূর্ণতার কারণ এখন বুঝি আর লজ্জা পাই। এখন আর তাঁকে অনুকরণ করি না অনুসরণ করি এবং সেটাও পাঠে। এখনও তাঁর লেখা সমান আলোজ্জ্বলা-তাঁর গদ্যের অর্থই মনের অন্ধকার হয়ে থাকা কোণকে আলোয় আলোয় ভরে তোলা। এখনও তার বইয়ের নাম কি সাংঘাতিক ভাবেই না কাব্যিক ‘এর প্রাচীর, ওর পথ’, ‘মাঝখানের মানুষেরা’ (তাঁর এই বইটির উৎসর্গ পাতায় তিনি আমার নামটিকে স্থান দিয়েছেন), ‘কুমুর বন্ধন’ ‘বন্ধুর মুখচ্ছবি’। সেদিন টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে কথা বলছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উপন্যাস প্রসঙ্গে। বলছিলেন, সেই উপন্যাসটির মধ্যে আছে কবিতার উপস্থিতি-আমি তাঁর এই কথায় চমকে উঠলাম, একই সঙ্গে তাঁকেও একজন কবি হিসেবে আমি আবিষ্কার করলাম। নিশ্চয়ই একজন কবির পক্ষেই সম্ভব উপন্যাসের কাব্য উপাদানকে এমন অব্যর্থভাবে শনাক্ত করা। আমার সৌভাগ্য হয়েছে কর্মসূত্রে এই গদ্যের কবির সান্নিধ্য পাওয়া। সাপ্তাহিক ‘সময়’ নামে একটি পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ছিলেন তিনি। দুই বছর সেই পত্রিকায় তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ‘অলাভজনক’ সেই ‘কুটির শিল্প’ (ড. হুমায়ুন আজাদের ভাষায়)। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ। সেই দুই বছর তাঁর (ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর) অনেক লেখারই প্রথম পাঠক হবার অভিজ্ঞতাকে আমি সারাজীবন আমার গৌরব মনে করব। যে বইটির আলোচনার সূত্রে উপরের এত সাতকাহন সে বইটির অধিকাংশ লেখাই সাপ্তাহিক ‘সময়’-এ ছাপা হয়েছে। মনে আছে যেদিন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম পরলোকগমন করলেন সেই সপ্তাহে তিনি একটি স্মৃতিকথামূলক রচনা লিখলেন, লেখাটি আমাদের সহকর্মী আজহার এসে পৌছবার আগেই আমি পড়ে ফেললাম। প্রবন্ধ পড়ে কাদবার অভিজ্ঞতা সেটাই আমার প্রথম। তিনি কোনও শিরোনাম দেননি। লেখাটি লিখে শেষ করার যন্ত্রণা তাঁর ভেতরও যে সমান কাজ করছে তা আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আমি লেখার ভেতরে উল্লিখিত শহীদ জননীর চিরকুটের অভয়বাণীকে শিরোনামে তুলে আনতে বললাম-‘ভয় পেয়ো না, বেঁচে আছি’-তিনি সম্মতি দিলেন। আরেক দিন চোখে পানি এল তাঁর ‘বর্ষা আমার মায়ের মত’ লেখাটি পড়ে। অসম্ভব আবেগবদ্ধ এক কবি যেন লুকিয়ে আছে তাঁর বৃকের গভীরে, যে কবি স্পষ্ট আর খজু উচ্চারণে বর্ষাকে নিয়ে রচনা করতে পারে গদ্য-আলেখ্য- বর্ষাকে আবিষ্কার করতে পারে জননীরাপে-বাংলাদেশের কোনও ঋতুকে নিয়ে এত সুন্দর উপলব্ধিযোগ্য লেখা আমি

কি আর পড়েছি? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ কিংবা হুমায়ুন আজাদের ‘ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না’ এরকম উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক লেখার বাইরে-ছোট অথচ অন্তরকম যেন ছোট নয় কোনও মতেই। মনে আছে ধ্রুব (শিল্পী ধ্রুব এম-এ সময়ের তুলনাহীন তরুণ শিল্পী, সে তখন সাপ্তাহিক সময়ের শিল্প নির্দেশক) কাগজ ছিড়ে, কাগজ কেটে, ‘মেঘ’ আর ‘বৃষ্টির ফোঁটা’ একেছিল-আর সেটা ছিল সময়-এর একটি ব্যতিক্রম সংখ্যা; যে সংখ্যার প্রচ্ছদ রচনা হয়েছিল ‘বর্ষা আমার মায়ের মত’ লেখাটি। প্রাণস্পর্শী এক গদ্যের

যায় উৎপল দত্তের বইটিকেই-উৎপল দত্ত তাঁর অগাধ পাঠ, পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ দিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শেকসপীয়রের সমাজ চেতনাকে সুন্দর এবং সাবলীলভাবে উন্মোচন করেছেন। ‘শেকসপীয়রের মেয়েরা’ বইটিতে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শেকসপীয়রের নায়িকা চরিত্রগুলোর ওপর আলোকপাতের পাশাপাশি তাদের সীমাবদ্ধতা, বিশিষ্টতা সম্পর্কে যেমন বলেছেন তেমনিই চিরকালের নারী প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন তাঁর অভুলনীয় কুশলী গদ্যে। বইটি সম্পর্কে চমৎকার পরিচিতি বক্তব্য রয়েছে ফ্ল্যাপে



অধিকারী তিনি। পাঠ এবং প্রজ্ঞা যাকে পাণ্ডিত্যে বৃদ্ধ কিংবা ন্যূন করেনি, করেছে চির তরুণ। যাঁর গদ্য কখনওই অপাত্রে বন্দনায় অন্ধ হয়নি (যেরকম অনেরা হয়েছেন), মেকী পাণ্ডিত্যও যাকে স্পর্শ করতে পারেনি, নিজস্ব নির্মোহতায়, নিজের কাজে নিমগ্ন থেকেছেন-কি যে অপরিচীত মমতায় পত্রিকার লেখা সম্পাদনা করেছেন, কত যে তরুণকে অনুপ্রেরণা দিয়ে লেখক করে তুলেছিলেন সেটা তাঁর স্নেহ-প্রশয় যারা পেয়েছে তারা বলতে পারবে। তরুণের প্রতি প্রবীণের এই প্রশয় এদেশে এই সময়ে তার দুটি দৃষ্টান্ত মিলবে না।

২. এ বছর বইমেলায় বেরিয়েছে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বই ‘শেকসপীয়রের মেয়েরা’। বইটির অধিকাংশ লেখাই অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক ‘সময়’ পত্রিকায় বেরিয়েছে। শেকসপীয়রের ১৮টি নাটকের নায়িকাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে লেখা ১৮টি রচনায় সমৃদ্ধ এই বই আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। ইংরেজি সাহিত্যের কালজয়ী নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপীয়রকে নিয়ে গত তিনশ’ বছর হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে-পৃথিবীতে এমন ভাষার সংখ্যা বিরল যে ভাষায় এই মহৎ প্রতিভার সৃষ্টি অনূদিত হয়নি, পঠিত ও জনপ্রিয় হয়নি। সারা পৃথিবীতে তাঁকে নিয়ে অনেক লেখা হলেও বাঙলা ভাষায় শেকসপীয়রকে নিয়ে লেখা মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা হাতে গুনে বের করা যাবে। উৎপল দত্তের লেখা ‘শেকসপীয়রের সমাজ চেতনা’ বইটি ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোনও বইয়ের কথা স্মরণে আসছে না। প্রয়াত কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি বই আছে ‘রবীন্দ্রনাথের শেকসপীয়র’ নামে সম্ভবত। শেকসপীয়র সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বই বলা

‘শেকসপীয়রের নাটকে ছেলেরাই প্রধান, মেয়েদের তুলনায়। সেটাই স্বাভাবিক, বাস্তবতা ছিল ওই রকমেরই আদর্শিক আধিপত্যও ছিল পুরুষেরই, যে আধিপত্য মেয়েরাও মেনে নিয়েছে। এবং শিল্পী হিসেবে শেকসপীয়র যতই নৈর্ব্যক্তিক হোন না কেন, তিনিও পুরুষ মানুষই। ওই জগতে তাই মেয়েরা প্রধান হয়নি, হবার উপায় ছিল না। তবু ক্ষেত্র বিশেষে মেয়েরা ছাড়িয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষকেও এবং কখনও কোনও অবস্থাতেই তারা উপেক্ষণীয় থাকেনি। যেখানে তাপ নয়, সেখানেও তারা আলো বটে।’ এই বক্তব্য থেকেই কি শনাক্ত করা যায় না ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী চরিত্রগুলোর ওপর শুধু আলোই ফেলেননি অনুভব আর উপলব্ধির শক্তিতে আলোকেও বিধৃত করেছেন। তাঁর সে অনুভবের সঙ্গে, উপলব্ধির সঙ্গে অন্ধআবেগ নেই আছে একটি সুতীক্ষ্ণ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে স্থূল কিংবা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করে না। এই গ্রন্থের ভূমিকার সমাপ্তি টানতে গিয়ে তিনি যেভাবে বলেছেন, ‘একটা সাংস্কৃতিক বক্তব্য আছে এই নাট্যকারের। সেটা এই যে, মানুষ উন্নত হতে পারে পরিবেশ ও প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেই। অন্যভাবে নয়। আর সে-কাজটা কেউ একা করতে পারে না, প্রয়োজন হয় পারস্পরিক সহযোগিতার, সৌহার্দের এবং ভালোবাসার।’ এ বছর একুশে ফেল্ডারের বইমেলায় একটি মহার্ঘ প্রকাশনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় নির্বিধায় এই বইটিকে। মনে পড়ে ‘অনতিক্রান্ত বৃত্ত’ পড়ে যে অসংখ্য প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-কৌতূহলে তাড়িত হয়েছিলাম সুদীর্ঘদিন পর তেমনিই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-কৌতূহলে তাড়না বোধ করছি। প্রথম সে তাড়না ছিল সমাজ-সাংস্কৃতিক-রাজনীতি সম্পর্কে আজ সে তাড়না ধ্রুপদী সাহিত্য সম্পর্কে।



সাবেক রাষ্ট্রপতি, পাবনার কৃতি সন্তান, পাবনা প্রেসক্লাবের সম্মানিত জীবন সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু চারদিনের পাবনা সফরের সময় গত ১০ সেপ্টেম্বর পাবনা প্রেসক্লাবে ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান (উপরে) এবং ১১ সেপ্টেম্বর (নিচে) তিনি পাবনা ডায়াবেটিক হাসপাতালে বন্ধুসহ অন্যান্যদের সঙ্গে।



-সম্প্রীতি বাংলাদেশ

অধ্যাপক ফখরুল ইসলাম

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে আমার স্মৃতিকথা কি লিখব ভেবে পাচ্ছি না, কারণ এই কলেজের দুই বছরের ছাত্রজীবন ও ২৮ বছরের শিক্ষকতা জীবনের এতো স্মৃতি জমা হয়ে আছে যে তা লিখে শেষ করা যাবে না। প্রাক্তন ছাত্র-সমিতির ঢাকা শাখার স্মরণিকায় আমার ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা কিছু লিখেছি।

আমরা তিনপুরুষ ধরে এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমার আব্বা, বড় ভাই, ছোট ভাই, আমার তিন ছেলে মেয়ে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। আমি পাবনার ছেলে। কাজেই আমার অগুণতি আত্মীয়-স্বজন এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছিল।

১৯৪৭ সালে পাবনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে এডওয়ার্ড কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হই। আব্বার মুখে এই কলেজের প্রাথমিক পর্যায়ের অনেক কাহিনী শুনেছি। সে সময় কলেজের হ-য-ব-র-ল অবস্থা ছিল। তারপরে আমার প্রয়াত বড়ভাই নুরুল ইসলামের কাছে তৎকালীন এডওয়ার্ড কলেজের ভূরি ভূরি কাহিনী শুনেছি। শুনতাম এবং ভাবতাম কবে ঐ কলেজের ছাত্র হব। স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বড়ভাইয়ের সঙ্গে যেতাম। বড় ভাইয়ের মুখে শুনে সে সময়কার অধ্যাপকবৃন্দের নাম আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সর্বশ্রদ্ধেয় আর. বোস, মাখনবাবু, বসন্তবাবু, হরিধনবাবু, তারিণীবাবু, বি.এল. বোস, প্রভাস লাহিড়ী, টি. হোসেন, মওলানা আবদুল হামিদ- এঁদের নাম শুনেছি। বড় ভাই ও তাঁর বন্ধুরা কলেজের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে নানা ঘটনার বিষয়ে রসালো আলাপ করতেন- আমি কাছাকাছি থাকলে সে সব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। বসন্তবাবু সম্বন্ধে একটা কথা এখনও আমার মনে আছে। কবিতায় বসন্তবাবু সম্বন্ধে উনার বলতেন, ‘তারিণী আমিতো মারিনি, মেরেছে বসন্ত ঘোষ, বল আমার কি বা দোষ।’

সেই এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হবার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ জুটে গেল ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পরে। আমারই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করা শেষ ব্যাচ। সদর্পে কলেজ অঙ্গনে প্রবেশ করলাম ভর্তির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে। শ্রদ্ধেয় বি.এল. বোস তখন কলেজের ভাষাপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। কারণ কিছুদিন আগেই আর. বোস কলেজ ছেড়ে কলকাতা চলে গেছেন। সেজন্য আর. বোসের ছাত্র হবার ভাগ্য হল না। বি.এল. বোসের সঙ্গে তাঁর চেম্বারে দেখা করলাম। উনি ম্যাট্রিকে আমার রেজাল্ট (দুইটি লেটারসহ) শুনে প্রশ্ন করলেন, ‘প্রথম বিভাগে পাস করে তুমি আর্টসে ভর্তি হবে কেন?’ আমি সরাসরি উত্তর দিলাম, ‘স্যার অঙ্ক আমার ভাল লাগেনা। সেজন্য আর্টস-এ ভর্তি হব।’ উনি বললেন, ‘ঠিক আছে, ভর্তি হয়ে যাও।’ প্রথম দিন থেকেই বি.এল. বোসের নজরে পড়ে গেলাম। কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার রোল নম্বর হল ২০। ইংরেজী, বাংলাসহ সাধারণ ইতিহাস, সিভিল্স-ইকোনমিক্স ও কমাশিয়াল জিওগ্রাফী পাঠ্য হিসাবে নিলাম। ফোর্থ সাবজেক্ট নিলাম না। আমাদের সময়ে সিভিল্স-ইকোনমিক্স এক পেপার ছিল- সিভিল্স ১০০ নম্বর ও ইকোনমিক্স ১০০ নম্বর। কলেজ জীবনে প্রথম ক্লাসটি ছিল বাণিজ্যিক ভূগোলের। স্যার রোল কল করার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করা কেউ আছে?’ আমি লজ্জায় দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমার দুই পাশে বসা সহপাঠীরা ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল। স্যার অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন এবং সহপাঠীদের কাঁধ দেখে মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলেন। প্রথমদিন উনি আমাদেরকে অনেক নছিবত করলেন। তারপর একে একে অন্যান্য ক্লাসগুলি হল। সিভিল্স-ইকোনমিক্সে কোন শিক্ষক ছিলেনা বলে ঐ ক্লাসটি হল না।

আমরা ১৯৪৭ সালে যখন কলেজে ভর্তি হই তখন কলেজে চরম transitional period চলছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম। আর্টসের অনেক বিভাগেই শিক্ষক ছিলেন না। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ছিল না কারণ তারা মাখনবাবু, বসন্তবাবু, হরিধনবাবু, নলিনী বাবুর মত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক পেয়েছিল- যারা সারাটা জীবন এডওয়ার্ড কলেজ অধ্যাপনা করেছেন এবং এই কলেজ থেকেই অবসর গ্রহণ করেছেন। আমরা যারা কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ছিলাম বলতে গেলে এক নাগাড়ে শিক্ষকের সহায়তা খুব কমই পেয়েছি। আমার ছাত্র জীবনটাই নানা ঝামেলার মধ্যে কেটেছে। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে লেখাপড়া করেছি। স্কুল জীবনটা মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কেটেছে। ১৯৩৯ সালে পাবনা জেলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই। সেই বছরই বিশ্বযুদ্ধ শুরু এবং ১৯৪৫ সালে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

খোদার অশেষ রহমতে খাবার-দাবারের কোন অসুবিধা ছিল না। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, নদীভরা মাছ ছিল। কিন্তু লেখাপড়ার সরঞ্জামাদি ছিল না- কাগজ ছিল না, দোকানে সময়মত বই পাওয়া যেত না, কেরোসিন তেল পাওয়া যেত না। কাঠের কলম দোয়াতে চুবিয়ে ক্লাস টেন পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়াশুনা করতে হত।

স্কুলের গভি পেরিয়ে কলেজে গেলাম- সেখানে শিক্ষকের নিদারুণ স্বল্পতা। রায়ে সেই কেরোসিন ও পোকা। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি অনার্স ক্লাসে ভর্তি হলাম- সেখানেও শিক্ষকের স্বল্পতা। ১৯৫০ সালের দাস্তার পরে-তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগই প্রায় শিক্ষকশূন্য হয়ে গেল। এক কথায় আমার পুরো ছাত্র জীবনটাই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কেটেছে।

জোড়া তালি দিয়ে কলেজের ক্লাস চলতে লাগলো। ফরিদপুরের রামদিয়া কলেজ থেকে সন্তোষ ভট্টাচার্য নামে একজন অধ্যাপক আমাদের কলেজে এলেন। এক নাগাড়ে অনেক দিন তিনি সিভিল্স, ইকোনমিক্স ও কমাশিয়াল জিওগ্রাফির ক্লাস নিয়েছিলেন। আজকালকার ছেলেরা হলে তাঁকে গ্রী-ইন-ওয়ান বলতো। স্যার আমাকে খুবই স্নেহ



২৮ বছর আগের স্মৃতি

এডওয়ার্ড কলেজের স্মৃতিময় দিনগুলো

করতেন। সন্তোষ স্যারের কথা কোনদিন ভুলব না। কলেজ চলতে লাগলো। আমরা যারা জেলা স্কুল থেকে পাস করেছিলাম কলেজ ছুটির পরে সবাই একসঙ্গে হৈ-হুল্লাড় করতে করতে বাড়ি ফিরতাম। আমার বাড়ি কলেজ থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে ছিল। বড় ভাই এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ডিটিংশন নিয়ে বিএসসি পাস করার পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। সেই সুবাদে তাঁর পরিত্যক্ত পুরানো সাইকেলটি পেয়েছিলাম। কখনও ঐ ভাঙা সাইকেলে বা কখনও পায়ে হেটে কলেজে আসতাম। সাইকেলটা প্রায়ই ‘হাসপাতালে’ থাকতো। কাজেই পদযুগলই ছিল প্রধান সম্বল। আমার পুরো স্কুল জীবনটাই অর্থাৎ আট বছর রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-বন্যা উপেক্ষা করে স্কুলে যেতাম। তখনতো এখনকার মত রিকশার ছড়াছড়ি ছিল না। আমাদের স্কুলে একটা নিয়ম ছিল যে, যদি কোন ছাত্র সারা বছর একদিনও স্কুল কামাই না করতো তাহলে তাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হত। ১৯৪৩ সালে যখন আমি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সেই বছর আমি এই দুর্লভ পুরস্কারটি পেয়েছিলাম। বইটা ছিল কবিগুরুর অমর সৃষ্টি ‘সোনার তরী।’

কলেজে ভর্তি হবার পরে স্যারদের সুনজরে পড়ে গেলাম, কারণ আমার বিচরণ ছিল সর্বত্র। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা- সর্বক্ষেত্রেই আমার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ছিলাম। শ্রদ্ধেয় বি.এল. বোস আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টের ভিত্তিতে তুমি মাসিক দশ টাকা হারে সরকারি বৃত্তি পেয়েছো। তোমাকে আর বেতন দিতে হবে না বরং আগে যে বেতন দিয়েছি সব ফেরৎ পাবে।’ এই খবর শোনার পরে আমার সে কি আনন্দ! জীবনের প্রথম বৃত্তি। আবার শুনে আমার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করলেন। মনে হল আমি আয় করা শিখেছি।

সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যে এসে গেল রষ্ট্রভাষার আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ কলেজ গেটের সামনের ঐতিহ্যবাহী আমগাছতলায় সমাবেশ করলাম এবং সিদ্ধান্ত হল আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করব। যে কথা সেই কাজ। বেলা ১১টার দিকে মিছিল বের হল। আমরা মিছিল করে প্রধান পোস্ট অফিসের পাশের ট্রাফিক মোড়ে পৌছলাম। উদ্দেশ্য ছিল জেলা প্রশাসক সাহেবকে স্মারকলিপি দেব। পুলিশ বাধা

দিল। সেই বাধা আর অতিক্রম করা সম্ভব হল না। পুলিশ মিছিলটিকে ঘুরিয়ে সবাইকে পাবনা থানায় নিয়ে গেল। সারাদিন আমরা থানা চত্বরে ছিলাম। সন্ধ্যায় আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হল। বি.এল. বোস ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। এক লম্বা ছুটির পরে কলেজে গিয়ে দেখলাম আমাদের নতুন অধ্যক্ষ এসেছেন- নাম এ. কে. মুখার্জি এম. এ. (ট্রিপলি)। বেশ সুটেড-বুটেড। বি.এল. বোস কত সাদাসিধে ছিলেন- আমাদেরকে কত আপন করে নিয়েছিলেন। উনার কাছে যেতে আমি কোন ভয়ই পেতাম না। মুখার্জীবাবু খুব গভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছাত্ররা তাঁর দ্বারে কাছেই ঘেঁষত না। আমি মাত্র একবার চেম্বারে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম কি একটা প্রয়োজনে। চেম্বারে আমার উপস্থিতি ছিল বড়জোর এক মিনিট। ঐ প্রথম এবং ঐ শেষ। অল্প কয়েকদিন পরেই এ.কে. মুখার্জী কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বি.এল. বোস ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হলেন- ছাই ফেলতে ভাসা কুলা আর কি! এরইমধ্যে কলেজ সংসদের নির্বাচন হল দেশ বিভাগের পরে প্রথম। আমি ম্যাগাজিন সেক্রেটারি হলাম। আমার সম্পাদনায় ১৯৪৭-৪৮ সালের ম্যাগাজিন পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

দেখতে দেখতে বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেল। আমরা বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বর্ষে উঠলাম। কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল অনেক জাঁকজমকের সঙ্গে। Truck events-এ শামছুল ইসলাম (ড. শামছুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ফিল্ড ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং Field events-এ আনসার ভাইয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। আনসার ভাই পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা বিভাগের ডাইরেক্টর হিসাবে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এডওয়ার্ড কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি ছিলেন। সেকালে এডওয়ার্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সকলের নজর কাঁড়তো।

এরইমধ্যে কলেজের বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাঁচটি বিষয়ে প্রথম হয়ে সে বছর আমি উক্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আমার বড় ছেলে ফয়জুল ইসলাম সুমন এডওয়ার্ড কলেজে আইএসসি ক্লাসে পড়ার সময় পরপর দুই বছর সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরে সুমন বিসিএস পাস করে ঢাকায়



পারিবারিক ছবি: মাঝে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ প্রফেসর ফখরুল ইসলাম ও পাশে সহধর্মিণী রত্নগর্ভা ফরহাভুন্নোসা। (বামে) ছোট ছেলে ফাহিমুল ইসলাম (সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়), (সামনে) বড় ছেলে ফয়জুল ইসলাম সুমন (অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও বাবেক চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন), (ডানে) ছোট মেয়ে ফারহিদা ইসলাম নীতু (অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক একটি হ্যাডমেড জুয়েলারি ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ডিজাইনার ও নির্মাতা), (সামনে) বড় মেয়ে অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ডা. ফারহানা ইসলাম নীলা (ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল)

ছবি : পারিবারিক অ্যালবাম থেকে পাওয়া

প্র্যানিং কমিশনে রিসার্চ অফিসার হিসেবে কর্মরত হয়েছিল। আমার ছোট ছেলে ফাহিমুল ইসলাম শোভন প্রথম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শোভন যে বছর ২য় বর্ষ আইএ সি পড়ে, সে বছর বিশেষ কারণে এডওয়ার্ড কলেজে বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি। শোভন বি.সি.এস পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসন ক্যাডার পেয়েছিল। পরে সে কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে চাকুরি করেছে। শোভন অস্ট্রেলিয়া সরকারের স্কলারশীপ নিয়ে (১৯৯৯) জন্ময়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনে দুই বছরের এমএ কোর্স করার জন্য অস্ট্রেলিয়া যায়। আমার বড় মেয়ে ফারহানা ইসলাম নীলা এডওয়ার্ড কলেজে আইএসসি-এর ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে নীলা ঢাকা মহাখালী বক্ষব্যর্থি হাসপাতালের ডাক্তার হয়। নীলা এসএসসি পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে বৃহত্তম পাবনা জেলায় প্রথম হবার কারণে প্রথম গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছিল। মাত্র সাত নম্বরের জন্য সে এইচএসসি ফাইনাল পরীক্ষায় কন্সাইন্ড মেরিটলিস্ট মিস্ করেছিল। যেমন শোভন মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য কন্সাইন্ড মেরিটলিস্ট মিস্ করেছিল এসএসসি পরীক্ষায়। ভাগ্যমন্দ আমার ছোট মেয়ে নীতুর। তার আর এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সৌভাগ্য হল না। কারণ গত বছর থেকে এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধ হয়ে গেছে। পাবনা মহিলা কলেজে মনমতো সাবজেক্ট পেল না বলে আমার বড় ছেলে সুমন নীতুকে ঢাকার ভিকারুন্নেসা কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে। সে সুমনের বাসায় থেকেই দ্বিতীয় বর্ষে ক্লাস করেছে। অনেকে হয়তো মনে করবেন আমি ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি। আমার মনে হয় এডওয়ার্ড কলেজ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে আমার আব্বা, ভাইদের এবং ছেলে-মেয়েদের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে যায়।

শ্রদ্ধেয় আজিমুদ্দিন সাহেব যখন এডওয়ার্ড কলেজে যোগদান করলেন অধ্যক্ষ হিসেবে, তখন আমরা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে এমএ পাস ছিলেন। স্যার আমাদের Rhetoric Prosody-এর ক্লাস নিতেন। উনার Rhetoric Prosody-এর উপর একটা বইও ছিল। Prosody পড়বার সময় স্যার বলতেন, ‘Water, Water, everywhere; Not a drop to drink’। তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজে। তিনি খুবই দরদী কিন্তু ভরৎস ছিলেন। আজিমউদ্দিন সাহেব আমাকে পুরস্কার মত স্নেহ করতেন। তাঁর শ্যালক আমার অতি প্রিয় বন্ধু সিরাজ হোসেন খান তখন দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞানে পড়তো এবং তার দুলাভাই আজিমউদ্দিন সাহেবের বাসাতেই থাকতো। সেই সুবাদে স্যারের বাসায় প্রায়ই যেতাম এবং চিলেকোঠার ঘরে বসে জম্পেস আড্ডা দিতাম। স্যার দেখেও দেখতেন না। তখনই পরিচয় প্রখ্যাত টেলিভিশন উপস্থাপক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাদ্দের সঙ্গে। তার ডাকনাম ছিল লাণু।

বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হল। কলেজ মাঠে প্যাভেল টানিয়ে দুইদিন ধরে জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠান চললো। অধ্যক্ষ আজিমউদ্দিন সাহেবের বিশেষ অনু্রোধে পল্লীকবি জসিমউদ্দিন সাহেব পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন প্রখ্যাত গায়ক বেদারউদ্দিন আহমেদ। আমরা জসিমউদ্দিন সাহেবের হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছিলাম। দুইদিন প্রাণভরে বেদারউদ্দিন সাহেবের গান শুনেছিলাম।

আজিমউদ্দিন সাহেব সু-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর লেখা ‘মহুয়া’ নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্য আমরা রিহার্সেল শুরু করলাম। কয়েকদিন রিহার্সেল চলার পরে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ সাহেব ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করার কারণে আমাদের সব আয়োজন ভেঙে পড়ে গেল। পরে সে নাটকটি করার সুযোগ পাইনি, যেহেতু দেখতে দেখতে আমাদের টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল।

আমরা যারা পাবনা জেলা স্কুল থেকে পাস করেছিলাম কলেজের সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্যই ছিল বেশী। যেমন আমিসহ আনসার ভাই, শামছুল ইসলাম, আবুল, আতা, কোরেশী, টিপু, সিরাজুল ইসলাম ও মরহুম বদিউর রহমান বদি। জিসি ইনস্টিটিউশন থেকে পাস করা গোলাম মোস্তফাও আমাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। মোস্তফাকে নিয়ে আমরা অনেক মজা করতাম, কারণ সে ছাত্রাবস্থাতেই বিয়ে করেছিল। আর ছিল সিরাজ খান, যে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এসে এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হয়েছিল। টিপু ক্যানাডায় জিওলজিতে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে প্রায় আট বছর চাকুরী করে দেশে ফিরে আসে। এর আগে টিপু পাকিস্তান জিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকুরী করতো। সিরাজ অর্থাৎ যাকে আমরা ‘ব্রেট সিরাজ’ বলতাম, পরে সে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবসর নিয়ে ঢাকার গুলশানে নিজের বাড়িতে বাস করে। বদি ফিসারী বিভাগে চাকুরী করা অবস্থায় অকালে মারা যায়। মোস্তফা পূবালী ব্যাংকের ম্যানেজার হয়েছিল। সিরাজ খান, যাকে আমরা ‘বড় সিরাজ’ বলতাম, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Soil Science-এ এমএসসি পাস করে কৃষি বিভাগে চাকুরী করে। সিরাজ খান চৌকশ খেলোয়াড় ছিল। ক্রিকেট, ফুটবল ও ডলিবলে সে পারঙ্গম ছিল। সিরাজ খানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সুনাম ছিল। আমাদের একটা গ্রুপ ছিল। টিপু, সিরাজ, সিরাজ খান, বদি ও মোস্তফা। টিপুকে আমরা ‘টাগা’ বলতাম। আমরা রোজ বিকেলে নতুন ব্রীজের পশ্চিমের ঢালে দক্ষিণ দিকের রেলিং-এ বসে আড্ডা দিতাম। আড্ডার আলাচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল কলেজের বিভিন্ন ঘটনা। সন্ধ্যার আগে ওখান থেকে হামিদ রোডে (তৎকালীন জ্যাকসন রোড) ‘আজাদ

গিরিবালা ও মহাশ্বেতার কলমে দুর্গাপূজা

ঔপন্যাসিক গিরিবালা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবী স্মৃতিচারণ করেছেন পাবনার দুর্গাপূজা নিয়ে। ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর দুর্গোৎসব বর্ণনা করেছেন তারা। পূজোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সাংস্কৃতিক হাওয়া বেগবান হয়েছে। তাঁদের স্মৃতিকথা পাঠক হৃদয়ে উপভোগ ও আশ্চর্যময়তা- দুটি অনুভব মিলে মিশে যায় এক সঙ্গে। এঁদের কলমে একের পর এক ছবির মতন ফুটে উঠেছে পুরনো পাবনার পূজো পাঁচালি। দুজনাই পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার জল হাওয়ায় বেড়ে উঠার পর স্থানান্তরিত হন কলকাতায়। সেকালের পূজোর দিনগুলিকে ঘিরে গার্হস্থ জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি একেছেন গিরিবালা দেবী।

গিরিবালা দেবী তাঁর মেয়েকে বলেছেন, ‘সমস্ত কিছু এমনভাবে লিখে গেলাম যাতে আমাদের প্রাচীন পূজা-আর্চা ব্রত নিয়ম নিখুঁতভাবে প্রতিফালিত হয়। লোকে পড়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান পেতে পারে।’ নিজের জীবন সম্বলিত লেখা রায়বাড়ি (১৯৯১) উপন্যাসে গিরিবালা লেখেন, ‘অনেক রাতে নবমীর আরতি সম্পন্ন হইল। যাত্রার পালা ছিল। বৃন্দাবনলীল। রাত শেষের দিকে গানও শেষ হইয়া আসিল। আজই ভোর বাজানো শেষ। বিজয়ার পরের দিন বাজানাদারেরা বিদায় লইবে। তাহাদের প্রাপ্য ধুতি-চাদর, কলা, আখ, নারিকেল, টাকা-কড়ি, বাহিরমহল হইতে বুঝিয়া লইয়া অন্দরে আসিবে বিদায় লইতে। বাড়ির প্রত্যেককে দিতে হইবে শাড়ি, ধুতি, গায়ের চাদর, জামা শেমিজ। ইহারা স্থানীয় লোক। ইহাদের উপজীবীকা বাজনা। বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। হীরাসাগর নদী অবধি নৌক চলাচল করিতেছে। সেই কারণে প্রতিমা নৌকায় তুলিয়া নদীতে বাইচ দিতে লওয়া হইবে। নিজেদের এলাকা ভিন্ন রায় বংশেরা। অন্য কাহারও মাটিতে প্রতিমা বিসর্জন দেন না। এমনি তাহাদের আভিজাত্য ও বংশ গরিমা। নদীতে রায়দের নৌকা নাই। নদীবিহীন গ্রামের প্রান্তে চলনবিল নদী সংলগ্ন। সেই বিলের উপকণ্ঠে অনেকটা ভাঙা জায়গায় রায়গোষ্ঠীর শ্মশানভূমি। মৃত্যুর কাছেও ইহাদের গর্ব পরাজিত হয় নাই। এমনই গর্বিত বংশের ধারা। বাহিরের ফুলবাগানের অদূরে যে গভীর দহ আছে, সেই খানেই ইহাদের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। দহের নাম দুর্গাদহ। হীরাসাগর নদীর মোহনার নাম মোহনগঞ্জ। এখানেই নৌকার সারি থামিয়া গেল। নাকালিয়া বন্দরের যাত প্রতিমা, পাথরকুচি গ্রামের যাত প্রতিমার নৌকা সব একত্রিত হইয়া মোহনগঞ্জ ও বন্দর অবধি বাচ খেলিতেছে। প্রতি নৌকার সহিত বাজনার নৌকা। পাথরকুচি গ্রামের মেয়েরা প্রতিমার নৌকার সহিত নৌকায় যায় না। তীরে সমবেত হইয়া নিরঞ্জন দর্শন করিয়া থাকে। প্রতিমার নৌকা চলিল দুর্গাদহের দিকে। তাহার পশ্চাতে অনুচর-পার্শ্বচরদের নৌকা। অদূরে ছোট খাটো একটা মেলা বসিয়াছে। জিলিপিগুলি রায়বাড়ির বরাদ্দ, যাহারা প্রতিমা বিসর্জন দিবে, সেই গঙ্গা পুত্রদের জন্য। প্রতিমাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরে ঝাপাইয়া পড়িল জেলেরা। প্রতিমা ভসিয়া উঠা অমঙ্গল। তাহারা উঠিয়াই ভিজা কাপড়ে ভিজা গায়ে জিলিপির পাতা লইয়া বসিয়া গেল। বাদ্যকরেরা বাজনা বাজাইতে লাগিল শূন্য মন্ডপের সম্মুখে। এ বাজনার ভিতরে সে আনন্দ গীতির আভাস নাই। করুণ বিলাপ তান বরিয়া পড়িতেছে। বিজয়ার রাত্রে রায় পরিবারে ভাত মাছ অচল। সকলের চুচি পুরির ব্যবস্থা হইল।’

আরতি সম্পর্কে গিরিবালা লেখেন, ‘আরতি শেষে সারি গানের গায়করা অগ্রসর হইল। ইহারা আউল বাউলের দল নয়। সারি গায়কের দল। ইহারা জাতিতে মুসলমান। পূজার সময় গ্রামান্তর হইতে আসিয়া পূজা বাড়িতে নাচিয়া গাথিয়া পার্বনী আদায় করে। সাংখ্যায় সাত আটটি লোক। সকলের পরিধানে কোরা বিলেতি ধুতি। গায়ে চাদর। পায়ে পিতলের নুপুর ও হাতে এক তারা। বা হাতে কৌচার খুঁট

ধরিয়া ডান হাত উর্ধ্ব তুলিয়া মাথার বাবরি চুল ও বুক সমান দাড়ি দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল। ইহার পরে ধুপ ভাঙ্তার পালা। ইহার পরে সর্দারেরা লাঠি খেলা দেখাইবে। সবশেষে গোলবারান্দার আঙিনায় যাত্রা গানের আসর। রায়বাড়ির দুর্গাপূজার ভোগশালা কাঠা পাঁচেক জমি জুড়িয়া। বন্দুকের ফাকা শব্দ করিয়া বাড়ি হইতে কাক, চিল, কুকুর, বিড়াল তাড়াইয়া দেওয়া হইল। মন্ডপের এক পাশে গালিচা পাতিয়া মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। ঝাড়ের বাতি, গ্যাস ও হাজারেকের আলোয় মন্ডপ আলোকিত। বাজিতে ছিল গ্রামোফোন। সেকালে গ্রামীণ পূজোর প্রধান উপকরণ চিড়া, মুড়ি মুড়কি, মোয়া, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের চাঁচ, নারিকেলের তক্তি মুক্তাবশীর নাড়ু, নারিকেলের চিড়া জিরার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রায়ভবন অর্থাৎ জমিদার বাড়িতে দাস-দাসী এবং পাচকের অভাব নেই। তিনি উল্লেখ করেছেন ক্ষীরের নাড়ু আর ঢ্যাপের মোয়ার কথা। এসবে দাসদাসীদের স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না।’ ‘মন্ডপের আড়ায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে কাঁদি কাঁদি কলা, নারিকেল, আখ, ফাঁকে ফাঁকে রচনার



গিরিবালা দেবী (১৮৯১-১৯৮৩)

হাঁড়ি। রচনা মানে ছোট ছোট মাটির হাঁড়িতে নিয়মের খই, মুড়কি, মুড়ি, চিড়া মোয়া, তিলের নাড়ু, বাতাসা ভরিয়া ছোট ছোট সরায় মুখ ঢাকিয়া দড়ি দিয়া চারিদিকে বুলান। এগুলি পাইবে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর, ছুতার, ভূমিমালি ও পদ্ম ফুল সংগ্রহকারীরা। মহাশ্বেতা দেবী।’ কথা শিল্পী মহাশ্বেতা দেবীর পূজোর স্মৃতিকথা উল্লেখ করছি। একথা তিনি লেখেন কলকাতার মাসিক মনোরম পত্রিকায় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে।’

‘আমারদের গ্রাম ছিল পাবনা জেলায় নতুন ভারেন্স। কলকাতা থেকে ঢাকা মেলে গোয়ালন্দ স্টেশনে পৌছানো যেত সকালে। পূজায় সকলেই দেশে যেতেন। গোয়ালন্দে স্টীমারে উঠে দেশের দিকে গমন। স্টীমারের নাম হত সাধারণত জলের পাখির নামে। কভোল, ওয়াইলড ডাক-এমন সব নাম। পদ্মার উজানে একটি অংশের নাম ঘনুনা। স্টীমারের ওপরে প্রথম শ্রেণীর কামরা ও ডেক। ডেক থেকে দেখা যেত দু’পারে ছাপানো পদ্মা, আর পাড় ডেঙে পড়ছে ঝপ ঝপ করে। পথে যেতে দেখা যেত চিচিফু প্রায় তারানগর গ্রামের দেওয়ানজী কুঠি। ওই দেওয়ানজী আমার মায়ের মাতামহ এবং স্বর্গত কবি অমিয় চক্রবর্তীর পিতামহ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীরা। ইনি পরে কুচবিহার স্টেটে জজ হন। দেশে যে পাকা বাড়ি করেন, তার নাম দেওয়ানজী কুঠি।

পদ্মা পাড়ের গ্রাম পদ্মার কোলেই ফিরে যায়। দৌলতপুর ভারেন্সা, তারপর ধুলজামা ভারেন্স, তারপর পুরনো ভারেন্সা, তারপর নতুন ভারেন্সা। নতুন ভারেন্সা পৌছবার আগে নগরবাড়ি, আর্চিয়া এমন অনেক স্টীমার স্টেশন পেরোতে হত। একবার প্রয়াত পরিচালক বিমল রায়, স্ত্রী ও ছোট্ট দুই মেয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গী ছিলেন। আর্চিয়াতে নেমে ওঁদের দেশ মাণিকগঞ্জে যাবেন। বিমল রায় ও আমার কাকা সুধীন ঘটক ত্রিশের দশকে সিনেমোটো-গ্রাফি শিখতে বিলেতে যান। ডেভিড লীন, আর্থার রডাংক, ফল্যাণ্ডক কাপরা- এঁদের সঙ্গে ওই দুই বাঙালির ছবি আমাদের পারিবারিক অ্যালবামে অনেক দিন ছিল। যেখানে স্টীমার দাঁড়াত, সেখানে উত্তোলিত বাঁশের খাঁচা থেকে গরম রসগোল্লা ও পাতক্ষীর খাওয়া ছিল লোভনীয় ব্যাপার। স্টীমারে চেপে দেশেও যেতাম। মামাবাড়ি ঢাকাও যেতাম। স্টীমারের রান্না অসামান্য। টাটকা ইলিশের ঝোল ও মুরগির ঝোল ছিল ডোজনরসিকদের প্রিয়। নতুন ভারেন্সা গ্রামে আমার মাতৃআলয়, পিত্রালয়ও বটে। ঠাকুর্দা সুরেশ-চন্দ্র ঘটক আর মাতামহ নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাল্য বন্ধু। এঁর ছেলে ওঁর মেয়ে বিয়ে হবে তা যেন জানাই ছিল। নতুন



মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)

ভারেন্সা গ্রামের কিছু ঐতিহ্য ছিল। স্বদেশী গ্রাম। সার্ভেট সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বাড়ি আমাদের ঘটক বাড়ির পাশে। আন্দামানে অনশনরত, এবং জোর করে খাওয়াবার চেষ্টায় নিহত মোহিত মৈত্র মায়ের জ্ঞাতি ভাই মোহিত দা। কাকেরি ষড়যন্ত্র মামলার শহীদ রাজেন লাহিড়ীও মায়ের জ্ঞাতি ভাই। কে কোন ভাই বলতে পারব না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা সবাই সবায়ের কেউ না কেউ হন। মাতামহ, পিতামহ, মা, বাবা, এরা থাকার সময়ের জানতাম সবাই খুব কাছের লোক। বড় মাসি গয়াতে থাকেন, তিনি এসব জানবেন। ভারেন্সাতে মামা বাড়ি, বা বড় বাড়িতে ছিল লাইব্রেরি ঘর। সেখানে ঘরে ঘরে লেখাপড়া। মার ঠাকুর্দাকে দেখিনি। জ্যাঠামশাই প্রথম নারায়ণ চৌধুরীকে দেখেছি। ওঁরা জমিদার ছিলেন। কিন্তু বলতেন, জমিদার খাজনা নেয়, জমির চাল নেয় না, চাল কেনে। ও কাজ করে জোতদার।’

‘এঁদের জমিদারির আয় নগণ্য ছিল, খাওয়াইন্যা ছিল অনেক। মার পিতামহ উমেশ চৌধুরী শেষ বয়সে কিরণশঙ্কর রায়দের জমিদারী তেঁওথায় চাকরি করতেন। আমরা মাতামহ ঢাকায় স্বদেশী উকিল, তাঁর ছেলেরাই আগে দাঁড়ান। পরিবারে যাঁরা কাজকর্ম করতেন, পাঁচজন দিয়ে থুয়ে পূজা হত। পিতামহ সুরেশ ঘটকের কোনো জমি

ছিল না। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুই বৌঠান থাকতেন ঘটক বাড়ি। তাঁদের খরচও ঠাকুর্দা পাঠাতেন, আর ঘটক বাড়ির পূজোও হত, বাবা ঠাকুর্দা, এঁদের খরচে। দু’বাড়ি কেন, ভারেন্সাতে কয়েকটি পূজোরই বৈশিষ্ট্য ছিল মাটির প্রতিমা, মাটির সাজ। বড় বাড়ির প্রতিমা বিসর্জনের আগে চরের মুসলমানরা এসে জারি গান করতেন, নইলে প্রতিমা বেরোত না। তারা ঢাল সড়কি নিয়ে আসত। বিসর্জনের নৌকায় আগে পিছনে তাদের নৌকা যেত, কেন তা বলছি। নতুন ভারেন্সা স্টীমার স্টেশন নদীর পাড়ে। কিন্তু আসল গ্রাম অনেক ভিতরে। সোনাপদ্মার খাল ধরে নৌকা চেপে যেতে হত। ঠাকুর ভাসানোর দিন, সোনাপদ্মা ধরে বড় নদীর পড়ার পর বাড়ির প্রতিমা আগে জলে ফেলা হবে, তারপর অন্যদের। এটি সম্মানের ব্যাপার। এটি যাতে সুনির্বাহ হয় তা দেখার জন্যই চরের প্রজারা আসত। আমরা যা দেখেছি। এই দুর্গাপূজার একটি বৈশিষ্ট্য বলব বলেই আজ কলম ধরা। কি বড় বাড়ি, কি ঘটকবাড়ি, পূজার সময়ে আত্মীয়, অনাত্মীয়, গ্রামের বাড়ির মানুষ, সবাইকে কাপড় দেওয়া হত, আর বিজয়ার দিন সন্ধ্যায় সবাই নতুন কাপড় পরে বিজয়া সন্ধ্যাষণ করতেন। এই কাপড় মানে বঙ্গলক্ষ্মী বা মোহিনী বা বাসন্তী মিলের ধুতি, শাড়ি, থান। সমস্ত কাপড় এক দামের। বিধবাদের থান, পুরুষদের লাল-কালো-সবুজ পাড়ের কাপড়। কত রকম নতুন পাড় তখন মিলের কাপড়েও আসছে। শঙখ পদ্ম পাড়, নৌকা-সূর্য-গাছ-গ্রাম আঁকা সিনারি পাড়, প্রদীপ পাড়, দশটাকার নোট, পাঁচ টাকার নোট ছাপা পাড়।’

‘পূজোর কাপড়ের গাঁঠারি খুললে তেমন ফ্যানসি পাড়ের দেখা মিলত না। দু’বাড়িতেই ছিল এক নিয়ম যে, তার বউ ছেলেমেয়েকে দামী কাপড় পরাতে চায়, কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে পরাতে পারে। দেশের পূজায় তা চলবে না। সবাইকে এক রকমই পরতে হবে। দেশি মিলের কাপড়। নিয়মটি হয়তো ভালো ছিল। তবে শৈশবের মনে বড় অভিমান হত। বলার উপায় ছিল না। আর খাওয়া দাওয়ার ছিল একই রকম। সবাই এক খাদ্য খাবে, এর এটি, ওর ওটি চলবে না।’

‘আগেই তো বলেছি স্বদেশী ভাবাপন্ন গ্রাম। দুর্গা পূজামন্ডপ উদ্বোধন করতেন। তারপর কোজাগরী লক্ষ্মী, কার্তিক, কালী, জগদ্ধাত্রী পূজামন্ডপ বন্ধ করতেন। অনেকদিন ধরে চলত পূজাপঞ্চ। এখন সে দিন নেই, সমাজব্যবস্থা নেই, তেমন মানুষরাও নেই। বড় বাড়িতে পূজার পর হত গ্রামীণ যাত্রাপালা, কৃষ্ণলীলা। একবার বড়-মামা শতীন চৌধুরী (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) উৎসাহ করে থিয়েটার দল আনান। কৃষ্ণলীলার সরলমেঠো গান, দেবলা-দেবী থিয়েটারের উত্তেজনা এখনো মনে আছে।’

‘তখনকার পূজায় এত গরম হাওয়া ছিল না, এখন যেমন দেখি। মোটা-মুটিভাবে মানুষজনের একটা অংশগ্রহণের ব্যাপার থাকত। আমাদেরও মাটির ঘর। বড় বাড়িতেও মাটির ঘর সব। চালচলতিও সাধারণ, বেশ মিশে যাওয়া যেত, হারিয়ে যাওয়া যেত। ভাঙনের দেশে পাকা দালান তোলা ভুল। আবহাওয়া খানিক অন্বরকম ছিল, শিক্ষা ও দেশপ্রেমের ঐতিহ্য ছিল। ছিল পরিবারে মেয়েদের খুব সম্মানের স্থান। এটা দুই পরিবারেই দেখেছি।’

‘আমার খেলুড়ি ছিল মামার দল। মায়ের কাকার ছেলে তেজুমামা ছিল খুবই দলের মানুষ। আমার গাছ চড়া, নৌকা চড়ে বিলের পদ্ম তোলা, জলে ঝাঁপাই, মাছ ধরার চেষ্টা, তেজুমামার সঙ্গে। আমাদের বাড়িটা যা তা, সে সব কথা যারা জানত, সবাই চলে যায়। ঋত্বিক অনেক জানত, সেও নিরুদ্দেশ, ছোট ভাইগুলো পলাতক। তেজুমামাটাও চলে গেল সেদিন।’

‘দীর্ঘকাল ‘পূজা’ নামটির সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললে হয়। শৈশবের সে সব পূজার স্মৃতি এখনো খুব কাছের বলে মনে হয়।’

সংগ্রহ: মোসাতাফা সতেজ

মরণফাঁসে মাছের ভান্ডার

প্রথম পৃষ্ঠার পর : সম্পদের প্রাচুর্যকে কাজে লাগিয়ে চলনবিলের অর্থনীতিতে গ্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। তবে পোনার বিবর্তনে চলনবিলের মৎস সম্পদের সেই সোনালি অতীত এখন রূপকথার গল্পে পরিণত হয়েছে। কারণ দিনে দিনে ছোট হতে হতে চলনবিল এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। তারপরেও উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ মাছের আবাসস্থল চলনবিল। অবশ্য এখানকার মাছ রাজধানিসহ বড় শহরের বাজারগুলোতে পাওয়া গেলেও, আসলে এসব মাছের বেশিরভাগই চাষ করা মাছ। সম্প্রতি সরেজমিনে দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিল চলনবিলের পাবনার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, নিষিদ্ধ ‘কারেন্ট’ জাল আর ‘চায়না দুয়ারি’ জালের অবাধ ব্যবহারে মারাত্মক হুমকিতে পড়ছে মাছ আর চলনবিলের জলজ জীববৈচিত্র্য। এসব অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জালে ধরা পড়ছে অতি ক্ষুদ্র পোনা থেকে শুরু করে সব ধরনের জলজ প্রাণী। ফলে কমে যাচ্ছে দেশিয় প্রজাতির প্রাকৃতিক মাছের বংশবৃদ্ধি। আর এতে করেই দিনে দিনে কমেছে চলনবিলের দেশি প্রজাতির মাছ। বর্ষার পানি নেমে যেতেই বিস্তীর্ণ চলনবিলের শুকিয়ে যাওয়া জলাশয়িতে মাছের বংশ নিবন্ধ করতে নির্বিচারে চলছে নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার। কথা হয় বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগীর সঙ্গে। তাঁদের একজন চাটমোহর উপজেলার হাভিয়াল গ্রামের জেলে হামিদুল ইসলাম। বর্ষার শেষ দিকে বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি জানান, কয়েক বছর আগেও খেওয়া জাল দিয়ে কয়েক ঘণ্টায় তিনি ২ থেকে ৩ কেজি মাছ ধরতে পারতেন। কিন্তু এখন দলবধে সারাদিন নৌকা নিয়ে যৌথভাবে ৫ থেকে ৮ কেজির বেশি পান না, যা ভাগ করে নিলে একজনের ভাগে এক কেজিও পড়ে না। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলায় অবৈধ ‘বাদাই’ ও ‘কারেন্ট’ জালের ব্যবহার এখন অতি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এর চেয়েও বিপৎসী হয়ে উঠেছে

‘চায়না দুয়ারি’ জাল। বাস্তব আকৃতির এই জালে একবার যেকোনো মাছ বা জলজ প্রাণী ঢুকলে আর বের হতে পারে না। ফলে পোনা মাছ, মা মাছের পাশাপাশি কচ্ছপ ও সাপের মতো বিভিন্ন জলজ প্রাণীও এতে আটকে মারা যাচ্ছে।

ঋতুভিত্তিক জেলে আবদুল আলিম বলেন, ‘বর্ষায় পানি কম থাকায় সাধারণ জালে মাছ পাওয়া যায় না। তাই অনেকেই বাধ্য হয়ে রাতে চায়না দুয়ারি জাল পেতে রাখেন। প্রথমে এ জালে ৫/৭ কেজি মাছ পাওয়া গেলেও এখন সারাদিনে ১/২ কেজির বেশি ছোট মাছ মেলে না।’ হাভিয়াল গ্রামের বয়োবৃদ্ধ সৃষ্টি হালদার আক্ষেপ করে বলেন, ‘তিন-চার দশক আগেও খেওয়া বা বেড় জাল দিয়ে দিনে ৮/১০ কেজি বড় মাছ ধরা যেত। গত দুই দশকে মাছ কমে যাওয়ায় জেলেরা কারেন্ট ও চায়না দুয়ারি জালের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই জালের ক্ষতিকর প্রভাব দেখে আমি বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে এখন সেলুনে কাজ করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘অতীতে আমরা যখন জালে মাছ ধরেছি তখন ছোট পোনা মাছ ধরা পড়েনি। ডিমওয়ালা মাছ ধরা পড়লে তাৎক্ষণিক ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ভরা মৌসুমে স্বাভাবিকভাবে যে মাছ পাওয়া গেছে, তা জমির মাছের বংশ বৃদ্ধি মারাত্তকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চলনবিলের বেশিরভাগ প্রাকৃতিক মাছের প্রজাতি হারিয়ে যাবে।’

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর গবেষণা বলছে, একসময় চলনবিলে ৮১ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে ২৭টি প্রজাতিই চরম ঝুঁকিতে রয়েছে, যার মধ্যে ১০টি বিলুপ্তপ্রায় এবং ৫টি

অতি বিপন্ন। গবেষণায় দেখান হয়েছে, ১৯৮২ সালের আগে বিলের যেখানে বার্ষিক প্রাকৃতিকভাবে ২৫,০০০ টনের বেশি মাছ উৎপাদিত হতো, ২০০৭ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২,২১৭ টনে। জলাশয় সংকটান, কৃষিজমির রাসায়নিক বর্জ্য এবং ক্ষতিকর জালের ব্যবহারই মাছ কমে যাওয়ার প্রধান কারণ। চলনবিল রক্ষা আদোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিবেশকর্মী মিজানুর রহমান জানান, সনাতন জালে ছোট মাছ ও পোনা বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু আধুনিক সূক্ষ্ম জালের কারণে চলনবিলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়ছে। এদিকে এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, পাবনার আতাইকুলা, ডেমরা ও হাদলসহ বিভিন্ন গ্রামে ঘরে ঘরে নিষিদ্ধ জাল তৈরির কারখানা অবৈধভাবেই গড়ে উঠেছে। শুধু ডেমরা এলাকায়ই রয়েছে অন্তত ২ শতাধিক কারখানা। স্থানীয় নারীরাও বাড়িতে বসে দিনভর চায়না দুয়ারি জাল তৈরির কাজ করছেন। এ বিষয়ে পাবনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীপক কুমার পাল বলেন, ‘সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বিলের পানি কমতে থাকলে মাছ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে, আর তখনই জালের ব্যবহার বেড়ে যায়। কারেন্ট ও চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার সম্পূর্ণ অবৈধ। আমরা নিয়মিত অভিযান চালিয়ে এসব জাল জব্দ ও পুড়িয়ে ধ্বংস করছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রতি বছর মাছের উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা মাছ। এখন বাজারে যে মাছ পাওয়া যাচ্ছে তার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে।’ তাঁর মতে, চলনবিলেরপ্রাকৃতিক মাছ রক্ষা করতে হলে শুধু প্রশাসনিক অভিযান করলেই হবে না, জনসাধারণকেই সচেতন করে হবে। ক্ষতিকর জালের ব্যবহার, এবং মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার না কমালে আগামী দিনে বিলীন হওয়ার অবস্থায় চলে যাবে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন।

জানুয়ারি থেকে ভোট

প্রথম পৃষ্ঠার পর : থেকে ধাপে ধাপে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু হবে এবং ২০২৭ সালের ৬ জুনের মধ্যে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন আয়োজন শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগোচ্ছে। তবে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কখন হবে, সেই সময়সূচি নির্বাচন কমিশনই নির্ধারণ করবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন দেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্ব ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই নির্বাচন আয়োজনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে হবে।

হামিদ সড়ক চার লেন

শেষের পৃষ্ঠার পর : হোসেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ মাল্লান, জেলা জামায়াতের নায়েব আমির হাফেজ মাওলানা ইকবাল হুসাইন, সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল গাফফার খানসহ সাংবাদিক এবং নানা শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।



বুধবার
১৪ অক্টোবর ২০২৬



‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।/ নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে।/ জাহ্নত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে।/ মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।/ অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে।/ যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ।/ চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে।/ অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’



স্বাস্থ্য
বাংলাদেশ

পৌরবাসীর পোড়া কপাল!

কর দিলেও সেবা পান না পাবনা পৌরসভার বাসিন্দারা। উল্টো সেবা পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে চাঁদা তুলে টাকা দিতে হয়। তারপরেও কপাল পোড়া পৌরবাসীর দুর্ভোগের শেষ থাকেনা। এবারের বর্ষাকালে মল-মূত্রে বোঝাই নর্দমার নোংরা পদার্থে ঘরবাড়ির ভেতর পর্যন্ত হাবুডুবু খেতে হয়েছে। এরপর এখন চলছে আরেক যন্ত্রণা। সেই দৃশ্যগুলোই ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর ক্যামেরায় উঠে এসেছে-



দৃশ্য-১



দৃশ্য-২



দৃশ্য-৩



দৃশ্য-৪



ছবি পরিচিতি

দৃশ্য-১ : পাবনার বাস টার্মিনাল রাস্তার পাশে মাসের পর মাস ধরে এভাবেই জমে আছে ময়লা আবর্জনার স্তুপ। এখানে এখন শুকরের দল মহোৎসবে মেতে থাকে।

দৃশ্য-২ : শহরের অন্যতম প্রধান পথ আতাইকুলার সড়কের দুটি দৃশ্য। নর্দমায় জমে থাকা আবর্জনা, ও মেরামতের নামে দিনে পর দিন বন্ধ করে রাখা পথ।

দৃশ্য-৩ : রাধানগর মজুমদার পাড়ার ডা. বীরেন্দ্রনাথ মোড়ের পৌরপথ। এই এলাকার ময়লা বা ড্রেন পরিষ্কারের জন্য পৌরসভাকে স্থানীয়দেরকে চাঁদা তুলে দিতে হয় টাকা। তারপর পরিষ্কারের নামে ড্রেনের পাশেই গাদা রাখা হয় ময়লার স্তুপ। এই স্তুপ সরাতেও দিতে হয় টাকা।

দৃশ্য-৪ : শহরের প্রধান বাজারে ঢোকার পৌরপথ। শহীদ বুলবুল কলেজ এলাকার দুটি দৃশ্য।

প্রথম পৃষ্ঠার পর : হেক্টর মিটা পানির ও বিল (২৪৭৬ হে.) কী পরিমাণ রকমারি মাছ উৎপাদন করা হয়- তার পরিমাণ মৎস্য বিষয়ক তথ্যবলীতে উল্লেখ নেই। মোট উৎপাদনের সঙ্গে আবাদকৃত এবং প্রাকৃতিক ভাগ করা নাই। এ কারণে হিসাবে রয়ে গেছে শুভংকরের ফাঁকি। নিবন্ধনকৃত ২৮ হাজার ৮১৬ জনসহ আরও কিছু অনিবেদিত জেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এঁদের মধ্যে মাত্র ৩ হাজার ২শজন ভিজিএফ সহায়তা প্রাপ্ত। উল্লেখ্য, ১৯৮৬-৮৭ সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ১৪ হাজার ৩৭৮ মেট্রিক টন মাছ পাওয়া গিয়েছিল। ১৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ : মাছের প্রাচুর্যে অতীত খ্যাত পাবনা জেলা ঘিরে অপরিবর্তিতভাবে দেওয়া হয়েছে ১৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ। এ কারণে মাছের অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তারপরেও জেলায় মোট ৫৩ হাজার ৭৪৫ ওক্টর ভূমিতে জলাশয়ে মাছ উৎপাদন হচ্ছে। জেলার মৎস্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, বর্তমানে ১২ হাজার ৪১৪ হেক্টর নদী, ৩,৭৬৫ হাজার হেক্টর বিল ও ১ হাজার ২৯৪ হেক্টর বরোপিটে মাছ উৎপাদন চলছে। সবচেয়ে বেশি রয়েছে প্লাবন ভূমি। যার পরিমাণ ২১,৬৬৭ হাজার হেক্টর। ৩২২টি সরকারি পুকুর ও দীঘির ২৬৬ হেক্টরসহ ৩৮ হাজার ৪৪০ পুকুর যার মোট আয়তন ৭ হাজার ৪১৬ হেক্টর। এখন নদীর ছোট মাছ দলভ হওয়ায় পুকুরের পাঙ্গাস- রুইয়ে তুণ্ড থাকছেন জেলাবাসী। বিপন্ন ৩৫ প্রজাতির মাছ : মৎস্য বিভাগ মাছের আবাস স্থল পুনরুদ্ধার সংরক্ষণ ও মৎস্য প্রজনন বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। স্থাপন করেছে ৪৪টি অভয়াশ্রম। জেলার পরিবর্তিত জলবায়ুতে ভিনদেশি প্রজাতির অগ্রাসন বুঝি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যে আফ্রিকার রাফেসে মাগুর ধংস করে দিচ্ছে

দেশীয় প্রজাতির মাছ। অন্যান্য মাছের মধ্যে রয়েছে তেলাপিয়া, সাধারণ কার্প, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, জাপানি রুই প্রভৃতি। যা বর্ষাকালে ছড়িয়ে পড়ছে পুকুর থেকে নদীতে। অপর দিকে আধুনিকরণ এবং নগরায়ণের সঙ্গে সামান্যপাতিক হারে বেড়ে চলেছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অস্তিত্ব চিকিৎসা রাখার বিভিন্ন সমস্যা। ধনবানদের অনুপ্রবেশে মৎস্য ব্যবসায় তৈরি হয়েছে অসমগ্রতিযোগিতা। তাতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা ধ্বংসের প্রান্তে পৌঁছে গেছে। পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় ৩৫ প্রজাতির মাছ বিপন্ন হয়ে পড়েছে- যেমন মহাশোল, গজার, নাদিনা, বাছা, চান্দা, চিতল, কাকিনা, খরশোলা, খলিশা, গোচি, গোরপিয়া, বাতাসি, সরপুটি, ফোলি, ভেদা, ভাগনা, মেনি, বাঘাইর, পাবদা প্রভৃতি। মাছের অভাব দূর করতে সুজানগর উপজেলার গাজনা বিলের সংযোগ নদী পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পুরণ হবে উপজেলাবাসীর পুষ্টি চাহিদা। রক্ষা পাবে জীববৈচিত্র্য। মৎস্য দপ্তরের তথ্য : জেলা মৎস্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, মাছ উৎপাদন বাড়াতে পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় আগে আটঘরিয়ার বিলচতরা, ভান্ডুড়ার গুমানি নদী ও বিলগভহস্তি জলমহালে একটি করে অস্থায়ী অভয়াশ্রম নির্মাণ এবং বিলচতরায় ফিসপেন ও বিল নার্সারি স্থাপনে বাঁধ নির্মিত হয়। অনুরূপ কাজ হয়েছে চাটমোহর ও ভান্ডুড়ার চলনবিল এলাকায়। স্বাদু পানিতে গলদা চিড়ি প্রকল্পের আওতায় দারগুরা ফিসারিজ লিমিটেড খামারটি প্রদর্শনী

মাছের যম ১৮ বাঁধ

হিসেবে গৃহিত হয়। সুজানগরে রয়েছে একটি মিনি হ্যাচারি। বেসরকারি হ্যাচারি রয়েছে ১৬টি। বেসরকারি নার্সারি ২২৬টি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে জেলার খাসপুকুর, মজা নদী, বিল ও বাওড় গুলো রয়েছে বেশির ভাগ প্রভাবশালীদের সমিতি, বিআরডিবি এবং কিছু দলীয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণে। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা অনেকেই জলমহাল ইজারা নিতে পারেন না। তাই তারা পেশায় টিকে থাকতে পারছেন না। চলনবিলে মাছের পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় ১৯৮২-১৯৯২ পর্যন্ত এই দশ বছরে মাছের উৎপাদন কমে হয়েছে ৩১ শতাংশ। ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত এই দশ বছরে কমেছে ৫৪ শতাংশ। এ তথ্য জানান মৎস্য বিশেষজ্ঞ লেখক সিরাজুল ইসলাম। যমুনায় পৌনে চার মণ ওজনের টাই মাছ : জেলার যমুনা নদীতে আগে পৌনে চার মণ ওজনের টাই মাছ পাওয়া যেত। পাঁচ কেজি ওজনের রিটা, পাঙ্গাস চিতলসহ বড় বড় বাঘাইড় ও আইডু মাছ পাওয়া যেত। ১৯৯১ এর ৫ ডিসেম্বরে ছাওয়ালা দহে ৪৬ কেজি ওজনের বাঘাইড় ধরা পড়ে জেলার জালে। তুলে অবাধ হতে হয় যে, পদ্মা নদী থেকে পাওয়া যেত সাড়ে তিন কেজি ওজনের ইলিশ। এখন তা স্বপ্ন। ৩৫ বছর আগেও বর্ষাকালে বাজারে চাহিদার তুলনায় দ্বিগুণ ইলিশ আমদানি হতো। তখন ডায়রিয়ার ভয়ে অনেকে বরফ দেয়া মাছ খেতে চাইতেন না। দেখা দিত পেটের গাঁড়া। পাচা ইলিশ মাছ বাজার থেকে জন্ম করতে পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা অভিযান চালাতেন। পাচা মাছ

বাজেয়াঙ করে জনগণের সামনে পুঁতে ফেলাতেন। এখন তার উল্টো হাওয়া। নদী আছে পানি নেই। জেলে আছে মাছ নেই। ১২০ বছর আগে পদ্মার ইলিশ রফতানির জন্যে ঈশ্বরদীর সাড়ায় গড়ে উঠেছিল মৎস্য বন্দর। ইতিহাসে পাওয়া যায়, ১৯০৭ সালে এ বন্দর থেকে ৪ হাজার ৭২২ মণ ইলিশ কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলা শহরে রফতানি করা হয়। তখন পানি সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল পাবনা। এছাড়া লাহড়ী মোহনপুর, দিলপাশার চাটমোহরসহ অন্যান্য রেল স্টেশন হতে বছরে ১২০ প্রজাতির ৬০/৭০ হাজার মণ মাছ রফতানি করা হতো রংপুর, দিনাজপুর এবং ভারতের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কলকাতাসহ কয়েকটি জেলায়। ১৯৪৯-৫০ এ ২৪ হাজার ২৮৫ মণ ১৯৫২-৫৩ সালেও ২০ হাজার ১৬১ মণ, পরের বছর ১২ হাজার ৬০৪ মণ মাছ অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা হয়। এসময় থেকেই মাছের প্রাচুর্য কমতে থাকে। বাড়তে থাকে একশ শতকে এসে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে পাবনায় নদী, বিল, পুকুর, প্লাবন ভূমি থেকে মাছ উৎপাদন করা হয় ৩০ হাজার ৯৩৬ মেট্রিক টন। ১৯৮৬-৮৭ বছরে ১৪ হাজার ৩৭৮ মেট্রিক টন। আরও জানা যায়, ১৯৭৭-৭৮ সালে বৃহত্তর পাবনায় মাছ উৎপাদনকারী বিলের সংখ্যা ছিল ১৫৯টি। বিলগুলোর আয়তন ৫৪ হাজার ৮৭৪ একর। এসময় মাছ উৎপাদনকারী পুকুর ছিল ১ হাজার ৮১০টি। নদী ও খালের বিস্তৃতি ছিল ১৮৪ বর্গমাইল। বর্ষা যখন নদীর পানি তীর উপচে নিম্নাঞ্চলের আবাদি ক্ষেতে চলে আসে তখন এসকল ক্ষেত মৎস্য খামারে পরিণত হতো। চাষী হতো জেলে। এখন কচিং সামান্য এলাকায় এমন ঘটে থাকে।



বগুড়ায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর টিএমএসএস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. আসাদুর রহমান হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৎক্ষিপ্ত ইতিহাসের উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি বক্তা ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) ডা. রবিউল হোসেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন (বাম থেকে) অধ্যাপক ডা. অনুপ রহমান চৌধুরী (ডোমেইন প্রধান টিএমএসএসএস চিকিৎসা শিক্ষা), অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক (গাইবান্ধা জেলা পরিষদের প্রশাসক), রোটারিয়ান ডা. মো. মতিউর রহমান (টিএমএসএসএসের উপ-নির্বাহী পরিচালক), অধ্যাপিকা ড. হোসেনে-আরা বেগম (টিএমএসএসএসের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক), অধ্যাপিকা ডা. মো. জাকির হোসেন (খ্রিস্টিপাল, টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ), ব্রিগে. জেনা. (অব.) ডা. মো. জামিলুর রহমান (পরিচালক, টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও রফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতাল, বগুড়া)

১৯৮ বছরে পাবনা

শেষের পৃষ্ঠার পর : কর্মচারীদের মারাত্মক অভাব ছিল। পুলিশের অযোগ্যতা এবং জমিদারদের পক্ষ থেকে ডাকাতি ঘটনার তথ্য গোপন রাখা বা এড়িয়ে যাওয়া হতো। রাজাজানি ছিল বিরাজমান। গ্রামাঞ্চলে ডাকাতেরা দলে দলে ঘুরে বেড়াত। চলনবিল এলাকায় জলদস্যুদের উপদ্রব চলছিল দীর্ঘ দিন ধরে। কালীনাথ চৌধুরী লেখেন, ‘রাজশাহী ও পাবনায় এক শ্রেণীর হুদ্র হিন্দু চৌর্যবৃত্তি করিয়া অচেল ধন সম্পত্তির মালিক হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাহাদের অনেকেই জমিদারি ত্রয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পরে তারা কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজেদের মহিমা প্রচার করিত। পাবনার সলপের স্যান্নাল পরিবার প্রভৃতি এই শ্রেণীর জমিদার ।’

প্রমথনাথ বিসী লেখেন, ‘এই চলনবিলে রাজশাহী পাবনা অঞ্চলের বহু লোক ডাকাতি ব্যবসা করিত। তার মধ্যে বহু জমিদার বংশের পূর্ব পুরুষ ছিল। তাদের দশটা ব্যবসার মধ্যে ইহাও একটা ব্যবসায়।’ এদের প্রতিরোধ করতে ও শাসনতান্ত্রিক সুবন্দোবস্তের জন্যে কোম্পানি সরকারের মতব্য অনুসারে পাবনায় সামগ্রিকভাবে ১৮২৮ সালে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। ১৮৩২-এ তা স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং তাকে স্বতন্ত্র ডিপুটি কালেক্টর রূপে নিয়োগ করা হয়। পাবনার ইতিহাস এছাে উল্লেখ রয়েছে, রাজশাহী জেলার ৫টি থানা ও যশোর জেলার ৩টি থানা নিয়ে সর্ব প্রথম পাবনা জেলা গঠিত হয়। সময় সময় এর এলাকা ও সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮২৮-এর ২১ নভেম্বর যশোরের খোকসা থানা পাবনাভুক্ত করা হয়। অন্যান্য থানাগুলোর মধ্যে ছিল রাজশাহী জেলার খেতুপাড়া, মথুরা, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ ও পাবনা। পাবনা পরিচিতি এছাে রয়েছে ‘যশোরের চারটি থানা। ধরমপুর, মধুপুর, কুষ্টিয়া ও পাংশা।’ তখন পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ ডব্লিউ মিলস জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত হন পাবনায়। ১৮৩৭ এ সেসন জজের পদ সৃষ্টি হলে এ জেলা রাজশাহীর দায়রা জজের অধীনে যায়। ১৮৪৮ সালের ১৭ অক্টোবর জেলার পূর্ব সীমা নির্দিষ্ট করা হয় যমুনা নদী। ১২ জানুয়ারি ১৮৫৫ তে সিরাজগঞ্জ থানাকে মোমনশাহী জেলা থেকে কেটে নিয়ে ১৮৬৬ সালে মহকুমায় উন্নীত করে পাবনা ভুক্ত করা হয়। নিযুক্ত করা হয় ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এর ২০ বছর পর রায়গঞ্জ থানা এ জেলায় সামিল হয়। নীল বিলোহ চলাকালে শান্তি শৃংখলার অবনতি হলে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ সালে জেলায় একজন কালেক্টর নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত হন মি সলোনি। এই একই বছরে আরো দুই জন কালেক্টর যথাক্রমে জিজি মরিস ও এইচ মোসপার্ট দায়িত্ব পালন করেন। তখন থেকে পাবনা পূর্ণাঙ্গ জেলার রূপ পায়। এর আগে ১৮৫৭ তে জেলা প্রশাসক হয়ে আসেন টি.ই. রোডেন। ১৮৭৯ সালে সিরাজগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয় পাবনার অধিনে। যখন কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে তখন স্বভাবতই এ জেলা ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মহারাণী ডিক্টোরিয়ার শাসনাধীনে চলে যায়।

জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে, ১৮৫৯ সালে পাংশা, খোকসা ও বালিয়াকান্দি এই তিনটি থানা নিয়ে পাবনার অধীনে কুমারখালী মহকুমা গঠন করা হয়। ১৮৬৩ সালে কুষ্টিয়া থানা এ জেলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭১ সালের মে মাসে পাংশা থানা ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমায় এবং কুমারখালী থানা কুষ্টিয়া মহকুমার সাথে সংযুক্ত করা হয়। এভাবে এ জেলার দক্ষিণ সীমানা হয় পদ্মা নদী। বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ, ১৮৫৫ সালে কুমারখালী থানা সৃষ্টি হলে তা ১৮৫৭ সালে পাবনার একটি মহকুমা হয়। ১৮৭১ সালে মহকুমা অবলুপ্ত করে কুষ্টিয়া মহকুমার অংশ করা যায় না। তবে বিচ্ছিন্ন মতবাদ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম অনুমান করেন যে, প্রাচীন রাজা পুন্ড্র বা পুন্ড্র বর্ধনের নাম থেকে পাবনা নামের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। তবে সাধারণ বিশ্বাস পাবনী নামের একটি নদীর মিলিত প্রোত ধারার নামানুসারে এলাকার নাম হয় পাবনা।

বিলুপ্তির পথে ফলসা

শেষের পৃষ্ঠার পর : কথা। ফলসাকে এথাবৎ পাবনার মূল ফলপ্রোতে অন্তর্গত হতে না দেয়ায় অবহেলা-অন্যদানের বিলুপ্ত প্রায়। জেলার সংবাদপত্রে, জীবন যাপনে, বাগান চর্চায় অপ্রচলিত ফলসা একটুও স্থান পায়নি। এই হারিয়ে যাওয়া ফলের কথা এখন আর কে ভাবে!

গ্রীষ্মের প্রকৃতিতে বর্ণসমারোহ আর অন্যান্য ফল দেখে চোখের আরাম আর মনের শান্তি। কিন্তু যখন ফলসার নাম মনে আসে তখন উদ্ভিদ প্রেমী মন যাদের, তারা বিচলিত হয়ে পড়েন। সমস্যাদর্শী এই শহর এলাকায় বা তার উপকণ্ঠে তেমন ফল গাছ নেই। মনোরম বর্ণনা দেবার মত বাবুর বাগান ছাড়া আর নেই। ঝাঁড়ির পানির মত ফলসা গাছ কোথাও কোথাও হয়তো রয়ে গেছে। কারোর তেমন নজরে আসেনি। যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে। পল্যাতক আসামি যেমন থাকে।

ফলসার ছড়াইে পাতা সবুজ মাখানো অনেকটা ডুমুর পাতার মত। গাছে আষ্টে পুষ্টে জড়িয়ে থাকে হলুদ হলুদ ফুল। যেন নাকছাবি। এ সময় গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালে ফলসা পড়ে ছড়িয়ে থাকে। শানের ওপর পড়েই রেনুও। থোকা থোকা ফলের সব গুলো একসঙ্গে পাকে না। তাই থোকা থেকে পাকা ফল বেছে পাড়তে হয়। পাকা ফলসার বঙ অনেকটা খয়েরি। শাঁস বেশ মিষ্টি লালাময় অল্প মধুর।

ফলসা শব্দটি এসেছে ফারসি থেকে। আকারে বেত ফলের মত। তবে অমন মসৃন নয়। বিলেতি গালের মত গা। পাকা ফল একদমের বেশি রাখা যায় না। জামের মত এ ফল বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। আষাঢ় মাস পর্যন্ত এ ফল পাওয়া যায়। রাধানগর মজুমদার পাড়ায় সিদ্দিক মিঞার বাগানে ছিল বেশ বড় একটি ফলসা গাছ। ত্রিশ বছর আগে গ্রীষ্মকালে গাছতলায় শিশুদের ভিড় লেগেই থাকতো। বানী সিনেমা হলের সামনের দিকে লাহিড়ী পাড়ায় একটি ফলস গাছ আছে। পাকা করা পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনায় ফল পড়ে টুপ টাপ করে। পেকে কালচে হয়ে যাওয়া ফলসা পড়ে ছড়িয়ে থাকে। শানের ওপর পড়েই ফেটে যায়। বৃষ্টির পানি লাগলে পাকা ফলে পচন ধরে। জামের মত আর কি। অল্পদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে একটি ফলসার গাছ আছে। পুরাতন বাঁশ বাজার মসজিদের পিছনেও একটি ফলসা গাছ ছিল, এখন আর নেই। সাধুপাড়া চাঁদা খার বাঁশতলায় ফটেছাফার রাতুল ইসলাম সুমনের বাড়িতে একটি ফলসা গাছ আছে। পৌর এলাকায় এদিক সেদিক আরও দু’চারটা ফলসা গাছ জানার বাইরে থাকতে পারে। আমাদের জীবন তো শহুরে জীবন। সমাজ থেকে খসে গেছে বাগান। বাড়ছে কেবল অনেসর্গিক আবহ। জেলার উপজেলা সমূহে পানি সংকট কালের নাম গ্রীষ্ম। এ সংকট উত্তোরনের পর আসে বড় রসের কাল। প্রকৃতিও ঋতুকে ভোগ করার মত মানুষেরা এ সময় নানা ফলের স্বাদটুকু শোষণ করে। দাবদাহে যারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ বা ফ্রিজের শীতল জল পান করে, আর বিভবাসনায় জীবনগাছের দিনে পাতা বরাতে থাকে- একটি একটি করে তাদের কাছে উদ্ভিদের কোন দাম নেই। আসলে ভুলে যাওয়ারই কথা, বাতাসকে উত্তপ্ত করে পৃথিবীর বুকে রচনা করতে হয় শূন্যতা। ছোটোতে হয় বাড়। এই শূন্যতার কারণেই পাবনা কি তাহলে ফলসা শূন্য হয়ে পড়েছে? প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষায় মক্ষস্থলে নারীদের অবদান ও তাদের স্বীকৃতির অভাব ঘোচাতে হবে। যাদের গাছ লাগাবার মত জাগয়া আছে তাদের উৎসাহ দেওয়া ও বৃক্ষ রোপণ দিবসে অন্যান্য চারার সঙ্গে ফলসা চারা বিতরণের ব্যবস্থা নিলে এ ফলের স্বাদ দুর্লভ হবে না শিশুদের কাছে। শরীরের জন্য খাবার উপযুক্ত সকল ফলেই উপকারী। এ কথা যত পালন করা যায় ততই ভালো। পরিবেশ সংরক্ষণে ফলগাছের ভূমিকাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই বসত বাড়ির আঙ্গিনায় দুর্লভ হয়ে যাওয়া ফলবৃক্ষের চারা রোপণ করা দরকার প্রত্যেকেরই। চিকিৎসকেরা বলেন, অপ্রচলিত ফল না খাওয়ার কারণেই শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে।

স্মরণ

চলে গিয়েও যে থেকে যায়

রুমী খোন্দকার

তের মাস শুধু দুটি শব্দ-‘তের মাস ’। অথচ এই দুটি শব্দের ভেতর কত দীর্ঘ অপেক্ষা, কত অশ্রু, কত না-বলা কথা, কত অসহ্য শূন্যতা জমে আছে-তা কেবল একজন সন্তানহারা বাবা-মাই জানেন। তের মাস আগে একমাত্র সন্তান জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সময় তার নিয়মে এগিয়ে চলেছে। দিন পেরিয়ে মাস হয়েছে, মাস পেরিয়ে বছরেরও বেশি। পৃথিবীর কোনো কিছুই থেমে থাকেনি। শুধু আমাদের ভেতরের একটি জায়গা সেই দিনটিতেই থেমে আছে। আমরা থেমে গেছি একটি শূন্যতার কাছে।

মৌমিতা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে পড়াশোনা করেছে। সে চারুকলা বিভাগের ৪২তম ব্যাচের (২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী ছিল। সেই একই বিভাগে ২০১৯ এর ৯ ডিসেম্বর শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে শেষ পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপক হয়েছিল। যে বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষাজীবনের অংশ ছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক হিসেবে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের পড়িয়েছে-এটি ছিল আমাদের জন্য গভীর আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

মৌমিতা খুব চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে ছিল। অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত কথা বলত না। নিজের কথা নিজের মধ্যেই রাখত। কিন্তু তার নীরবতার মধ্যেও ছিল এক ধরনের দৃঢ়তা। ছিল ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনো অহংকার ছিল না। বিনয় ছিল তার স্বভাবেরই একটি অংশ। তাকে দেখলেই বোঝা যেত, সে নিজের একটি স্বতন্ত্র জগৎ নিয়ে চলতে জানত।

গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর ছিল জাকসু নির্বাচন। রাত ১২টা পর্যন্ত ভোট গণনা শেষে কোয়ার্টারে ফিরে আমায় ফোন দিল। ফোনটা প্রথমবার বাজতেই আমি ধরি নাই। সারাদিন ভোটের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাস্তির বিষয় মাথায় রেখে ভেবেছিলাম এখন আর ধরব না! ২ মিনিট পর আবারও রিং হলো। সেটাও ধরলাম না। তৃতীয়বার ফোনের স্ক্রিনে ‘মৌ’ নামটা উঠতেই একটু উতলা হয়ে ধরলাম।

– আব্বু, কোনো বিপদ হয়নি তো?

ওপাশ থেকে মৌ তার চিরচেনা শাস্ত, নিবিড় গলায় বলল–

– কিছু না আব্বু... তুমি রিডিং রুমে? পড়ছ এখনও?

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম–

– না আব্বু, চশমাটা টেবিলে রেখে একটু জিরোছিলাম। এত

রাতে খামখেয়ালি করে ফোন দিলে কেন বল তো?

মৌ ওপাশ থেকে কিছুক্ষণ নিখর নীরবতা রেখে ধীরস্বরে বলল–

– আচ্ছা আব্বু, তুমি জিরোও। ঘুমিয়ে পড়ো।

পারলিন লাল ইটের ক্যাম্পাসটায় যখন সন্ধ্যার আলো ফুটল,

আমি ওকে কল করলাম। একটু হেসেই জিজ্ঞেস করলাম–

– কাল রাতে অসময়ে বারবার ফোনে কড়া নাড়ছিল কেন, আব্বু?

মৌ বিষণ্ণ অথচ মিষ্ট একটা হাসি দিয়ে বলল–

– এমনিই... হঠাৎ মনে হলো তোমার গলাটা একটু শুনিত।

আমি আর উত্তর দিতে পারিনি। কথাগুলো বুকের ভেতর এক অলৌকিক হায্যাকার তৈরি করেছিল। পরে শুকলাম, ১২ সেপ্টেম্বর সিনেট ভবনে ভোট গণনাকালীন উপস্থিত সময়ে মেয়েটি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আমাদের ছেড়ে ওপারে চলে গেছে– আজও বরা পাতার শব্দ হলে কিংবা ওই ক্যাম্পাসের ছায়াবীথিতে দাঁড়ালে মনে হয়, ও ঠিক ওপাশ থেকেই আমায় ডাকছে। ছায়াময় সেই গলাটা আজও আমার বুকের কোণে একইভাবে প্রতিধ্বনি তুলে যায়।

আমরা দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক। পাবনায় আমাদের বাড়ি। মৌমিতা পাবনা থেকেই এইচএসসি শেষ করেছিল। সেই বাড়ি, সেই শহর, সেই পরিচিত পথ-সবকিছুর সঙ্গেই তার শৈশব ও কৈশোরের অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আজ সেই বাড়িতে আমরা দুজন-বাবা ও মা। আর কেউ নেই।

বাড়িটি আছে। মরগুলো আছে। আসবাবপত্র আছে। কিন্তু মৌমিতা নেই। তার শৈশবে ব্যবহার করা কত জিনিস আমরা

রূপপুরের বিদ্যুৎ অনিশ্চিত

শেষের পৃষ্ঠার পর : (এমপিএ) উচ্চ-চাপ পরীক্ষা সফলভাবে শেষ হয়। এরপর প্রায় ১৮ এমপিএ চাপে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এটি সফল হওয়ার পর ফিশন রিয়াকশন শুরু করা যাবে। এই প্রক্রিয়া শেষে পাওয়ার স্টার্টআপে যেতে পুরো অক্টোবর মাস লেগে যাবে।

পাওয়ার স্টার্টআপের পরেই গ্রিডে বিদ্যুৎ দেওয়ার বিষয়টি আসবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আশা করা হচ্ছে, আগামী নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত মোট বিদ্যুৎ ক্ষমতার ৩০ শতাংশ বা ৩শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নির্মাণের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. কবীর হোসেন সম্প্রীতি বাংলাদেশ প্রতিবেদককে বলেন, এই অক্টোবরে রূপপুরের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে দেওয়া সম্ভব হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাওয়ার স্টার্টআপে যাওয়া সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে- রূপপুরের বিদ্যুৎ গ্রিডে যাচ্ছে। চূড়ান্ত ধাপের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হতে পুরো অক্টোবর লেগে যাবে। সেফটি ভালভে ১৬ মেগাপ্যাসকেল উচ্চ-চাপ পরীক্ষা সফলভাবে শেষ হওয়ার পর এখন ফিশন রিয়াকশন চলছে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া শেষে পাওয়ার স্টার্টআপে যেতে অক্টোবর মাস লেগে যাবে। পাওয়ার স্টার্টআপের পরে গ্রিডে বিদ্যুৎ দেওয়ার বিষয়টি আসবে। পাওয়ার স্টার্টআপে না গেলে কবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে- এটা বলা যাবে না।

ড. মো. কবীর হোসেন আরও বলেন, ফিশন রিয়াকশন শুরু হলেও সেখানে অনেকগুলো পরীক্ষা আছে। এই রিয়াকশনকে স্থায়ী করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, শিডিউল অনুযায়ী রূপপুরের প্রথম ইউনিটের উৎপাদনের আসার এক বছর পর দ্বিতীয় ইউনিটের উৎপাদনে আসার কথা। তবে এখন কাজের যে অগ্রগতি এতে ২য় ইউনিটের উৎপাদন এক বছর পর শুরু করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে।



জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা
(১৯৯৫-২০২৫)

আজও যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছি। সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, এই তো সেদিনও সে ছিল। তার ছোটবেলার স্মৃতিগুলো যেন জিনিসগুলোর মধ্যেই জমে আছে।

ডাইনিং টেবিলে তার চেয়ারটি এখনো আছে। তার থালাটিও যেন আগের মতোই রাখা। কতবার মনে হয়, একটু পরেই হয়তো সে এসে সেই চেয়ারে বসবে আমার গা ঘেষে। খাবার টেবিলে বসে হয়তো দু-একটি কথা বলবে। কিন্তু সে আর আসে না। একটি চেয়ার কতটা শূন্যতা বহন করতে পারে, একজন সন্তানহারা বাবা-মা তা জানেন।

মৌমিতার রুমে গেলে কখনো কখনো মনে হয়, সে যেন এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। তার পরিচিত জিনিসগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। অথচ মানুষটি নেই। এই না-থাকার অনুভূতিই সবচেয়ে কঠিন। বাড়ির প্রতিটি কোণে তার শৈশব আজও বেঁচে আছে।

একজন বাবা-মা সন্তানের মৃত্যুর পর শুধু একজন প্রিয় মানুষকে হারান না; হারান নিজেদের ভবিষ্যতের একটি বড় অংশ। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মৌমিতা ছিল আমাদের একমাত্র সন্তান। তার কোনো ভাই-বোন নেই। আমাদের বয়সের এই সময়ে এসে তার চলে যাওয়া যেন জীবনের শেষ প্রাণ্তে এসে একটি বিশাল দরজা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো।

এক বছরের একটু বেশি হয়ে গেল। তবু শোকের কোনো বার্ষিকী হয় না। ক্যালেন্ডারে একটি তারিখ আসে, চলে যায়; কিন্তু বাবা-মায়ের হৃদয়ে সেই দিনটি প্রতিদিন ফিরে আসে। মৌমিতাকে আমরা আর ছুঁতে পারব না, তার কণ্ঠ আর শুনতে পাব না, তার সঙ্গে বসে কথা বলতে পারব না। কিন্তু তার স্মৃতিকে তো কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

মৌমিতা, তুমি ছিলে আমাদের একমাত্র সন্তান। তাই তোমার চলে যাওয়ার পর আমাদের পৃথিবীটা যেন সতিাই অর্ধেক নয়, অনেকটাই শূন্য হয়ে গেছে। তোমাকে নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন ছিল, তার অনেকটাই অর্পূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু তোমার জীবন বৃথা যায়নি। তুমি পড়েছ, জেনেছ, শিক্ষকতা করেছ, শিক্ষার্থীদের তথা পুরো ডিপার্টমেন্টের ভালোবাসা পেয়েছ এবং নিজের মতো করে একটি জীবন গড়ে তুলেছিলে। তোমার বাবা-মা হিসেবে এটাই আমাদের সাত্ত্বনা-তুমি আমাদের সন্তান হয়ে এসেছিলে, কিন্তু তোমার নিজের আলোয় তুমি একজন স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে উঠেছিলে। তোমার ডিপার্টমেন্ট ‘তুমি রবে নীরবে’ শিরোনামে স্মরণানুষ্ঠান করেছে।

আজ তোমার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে শুধু একটি কথাই বলতে চাই-মৌমিতা, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ, কিন্তু আমাদের জীবন থেকে চলে যাওনি। পাবনার সেই বাড়িতে তোমায় চেয়ার, তোমার থালা, তোমার শৈশবের জিনিসপত্র যেমন তোমাকে ধরে রেখেছে, তেমনি আমরা তোমাকে ধরে রেখেছি আমাদের স্মৃতির প্রতিটি পাতায়। তুমি ছিলে, তুমি আছ-আমাদের স্মৃতিতে, আমাদের নিঃশ্বাসে, আমাদের নীরবতায়। আল্লাহ আমাদের প্রিয় মৌমিতাকে মা করুন। তাঁর কবরকে নূর ভরে দিন, তাঁকে শান্তি দিন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।

রুমী খোন্দকার : প্রয়াত জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতার বাবা। পেশায় তিনি শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং কবি

পাবিপ্রবির প্রথম

শেষের পৃষ্ঠার পর : প্রশাসনের আলোচনা সাপেক্ষে

সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করা হয়েছে। এ সময় দেশ ও বিদেশের কর্মসংস্থান উপযোগী প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা দানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে বঙ্গভবনে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আহসান। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ একর জায়গা আছে এবং ৫টি অনু্ষদের অধীনে ২১টি বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরও ৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা এবং চাকরির বাজারে চাহিদা আছে- এমন সাবজেক্ট খোলার বিষয়েও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা এবং উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়।

১৯৮ বছরে পাবনা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

১৬ অক্টোবর পাবনার ১৯৮ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে পাবনা স্বীকৃতি লাভ করে। সরকারের ৩১২৪ নং স্মারকপত্র অনুসারে মালদহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ মিলস পাবনায় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্তি হন। থানাগুলোর মধ্যে রয়েছে পাবনা, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ, ক্ষেতুপাড়া, ধরমপুর, কুষ্টিয়া ও মধুপুর। পরে পাংশা যুক্ত করা হয়। জেলার ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে ১৭৯০ সালের দিকে জেলার বেশির ভাগ অংশ রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার দিনে এসব এলাকায় সরকারের দায়িত্বপূর্ণ

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পরিবেশ

বিলুপ্তির পথে ফলসা

■ সৈয়দ মুসতাহী বৃন্দা



প্রকৃতির নিয়মেই আমাদের জীবনে গ্রীষ্ম বর্ষা আসে। সঙ্গে আসে নানা রকম ফল ফলারি। কিন্তু ফলসার দেখা পাওয়া যায় না। এ প্রজন্মের খোকা-খুকুদের হাতে ফলসা তুলে দেবার সৌভাগ্য হয় না অভিভাবকদের। যারা জীবনে ফলসা দেখেনি, এনসাইক্লোপিডিয়া যাদের ধ্যান জ্ঞান- তাদের জীবনে ইংরেজি মতে গ্রীষ্মকাল আসে, আম, লিচু, কাঁঠাল আসে, ফলসা আসে না। পাবনা পৌর এলাকায় ৪০ বছর আগেও প্রায় সকল মহল্লায় মিনি বাগান ছিল। এখন সে সব ইতিহাস। বাগান উচ্ছেদ করে বসতবাড়ি গড়ে উঠেছে। সমঝদার মানুষেরা গত হয়েছেন। কেউ শহর ছেড়েছেন। এসেছেন বনিকুল। গড়ে উঠেছে মার্কেট। কাঁচা পাকা বাড়ি। তাই বাগানের শোভা উঠে গেছে। আঙিনাতেও তেমন ফলগাছ নেই। এসেছে স্থাপত্য শিল্প। এসবে বঞ্চনা আছে। কিন্তু রোমাঞ্চ নেই। আজকালকার শিশুরা অনেকে ফলসার নাম পর্যন্ত শোনেনি। খাওয়াতো স্বপ্নের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১



রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ

পাবিপ্রবির প্রথম সমাবর্তন আগামী বছরের মার্চে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন সম্ভাব্য ১৫ অথবা ১৬ মার্চ ২০২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সঙ্গে পাবিপ্রবি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ডিসেম্বরে আসছে ৯ কার্গো জ্বালানি

রূপপুরের বিদ্যুৎ অনিশ্চিত

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। গতমাসেও এ ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা পেরুতে হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য ইউরেনিয়াম জ্বালানি নিয়ে যে কার্গো বিমানটি বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা ছিল, পাকিস্তান তাতে বাধা দেয়ায় প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত আটকে ছিল ইউরেনিয়াম জ্বালানি আসা।

ওয়াকিবহাল সূত্র জানায়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ইউরেনিয়াম বহনকারী একটি কার্গো বিমান গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আসার কথা ছিল। কিন্তু বিমানটি পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি না পাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে জ্বালানি আনা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মার্কিন ও ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া



ইউরেনিয়াম জ্বালানি নিয়ে যে কার্গো বিমানটি বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা ছিল, তাতে বাধা হিসেবে কাজ করেছে পাকিস্তান

বিকল্প আকাশপথ ব্যবহার করতে হয়। এই রুটের মধ্যবর্তী কোনো দেশের আকাশসীমা ব্যবহারের প্রয়োজনীয় অনুমতি বা ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ায় বিমানটি নির্ধারিত সময়ে ছাড়তে পারেনি। অবশ্য পরে এক সপ্তাহের মাথায় রাশিয়া থেকে সরাসরি বিশেষ কার্গো

উড়োজাহাজে ইউরেনিয়াম জ্বালানি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছায়। এরপর তা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রূপপুর প্রকল্প এলাকায় আনা হয়। সূত্র জানায়, ২য় ইউনিটের জন্য মোট ৭টি কার্গো এবং প্রথম ইউনিটের রিফিলিংয়ের জন্য দুটি কার্গোসহ মোট ৯টি কার্গোতে এই জ্বালানি আসছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই পুরো জ্বালানি বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে রোসাটম।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক 'যড়যন্ত্র' বা 'বাধা'র বিষয় রয়েছে কিনা- সে ব্যাপারে কেউ মুখ না খুললেও জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত বলে জানা গেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্পের নিরাপত্তা ভাঙের ঝুঁকিতে একটি সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এর সমাধানে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে রাশিয়ার পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল রূপপুর সাইটে কাজ করেন। এরপ ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁরা সেফটি ভালভের কারিগরি ত্রুটি সমাধানে সক্ষম হন। ইউনিট-১ চালুর আগে এই অর্জন ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩



হামিদ সড়ক চার লেন করা নিয়ে মতবিনিময়

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা শহরের মূল সড়কপথ আবদুল হামিদ সড়ক চারলেনে বর্ধিতকরণ নিয়ে অংশিজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের সভাপতি এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস এমপি।

জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভায় জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশ্ব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাখাওয়াত

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সম্প্রীতি বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে



নতুন বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে সম্প্রীতি বাংলাদেশ অগ্রযাত্রার নতুন ধাপে পা দিয়েছে। এখন বিশ্বের সব দেশের সব জায়গা থেকে ওয়েব প্লাটফর্মে পড়া যাবে সম্প্রীতি বাংলাদেশ।



পাঠক, গ্রাহক, লেখক এবং শুভানুধ্যায়ীরা এই প্লাটফর্মে শুধু সম্প্রীতি বাংলাদেশ পড়তেই পারবেন না- মতামত দিতে পারবেন, লিখতে পারবেন। বিজ্ঞাপনদাতারাও এই বিশালত্বকে কাজে লাগাতে পারবেন।



সম্মানিত
পাঠক, গ্রাহক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ী- আমরা সকলের অংশগ্রহণ এবং সম্প্রীতি চাই। এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে চাই সহযোগিতা।

-প্রকাশক



আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার ওয়েব প্লাটফর্ম লিঙ্ক :



<http://sompribangladesh.com>



প্লাফর্মের ই-মেইল :

sompribd@gmail.com

CARE YOU CAN TRUST

Services we provide

- Dental Implants
- Root Canal Treatment
- Treatment of Oral Cancer
- Dental Extraction
- Tooth Colored Filling
- Scaling & Polishing
- Fixation of Jaw Fracture
- TM Joint Dysfunction

Why choose us?

- Highest Measure for Sterilization
- Modern State of Art Equipment
- Comprehensive Consultation & Treatment Plan
- Exact Costing Plan Before Even Starting the Procedure.



DR. MAUSUMI IQBAL
FRCPS
IN-HOUSE MAXILLOFACIAL SURGEON
BMDIC reg no. 3395

DR. MEZBAH UL AZEEZ
MDS
IN-HOUSE PERIODONTIST
BMDIC reg no. 3606



Scan here

tooth care
দাঁত কেয়ার

Address
14/1, Mirpur Road BTI Emporium
4th Floor Shyamoli, Dhaka
Bangladesh

Clinic hours

Saturday to Thursday
12:30 pm to 8:00 pm
(Closed on Fridays and Govt Holiday)

এস.বি ০০০/৬৩